

রাগিব হাসান

বিদ্যাকৌশল

লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা



বিদ্যাকৌশল

লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা



কারো জন্য পড়াশোনা করা, ভালো ফলাফল করা, ভালো করে কিছু শেখা খুব সহজ কাজ।

আবার কারো জন্য এটা খুবই কঠিন একটা কাজ।

কিন্তু কেন? মেধা? মেধা একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু একমাত্র ব্যাপার না।

মেধা জন্মগত বটে, কিন্তু গোপন কথাটা হচ্ছে, মেধা কিন্তু কারো ভালো শিক্ষার্থী হবার প্রধান নিয়ামক নয়। অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে মেধা একটি মাত্র ফ্যাক্টর। আর সুখবরটা হলো চেষ্টা ি য়ে, কায়দাকৌশল শিখে মেধার কমতিটা পুশিয়ে নেয়া অবশ্যই সম্ভব।

এই বইতে ভালো করে সঠিক নিয়মে পড়াশোনা করা, কোনো কিছু শেখার কায়দাকৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। ভালো ছাত্ররা এই কৌশল জানে— কিন্তু অন্যদের জানাতে চায় না।

ছাত্রজীবনে রাগিব হাসান বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসিতে বোর্ডে ৪র্থ স্থান এবং এইচএসসিতে ১ম স্থান লাভ করেন। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে বুয়েটে ভর্তি হন এবং সব বিভাগের সেরা ফলাফলের জন্য চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল পান।

নিজ ফলাফল ছাড়াও ছাত্রজীবন এবং বর্তমান শিক্ষকতা-জীবনে প্রচুর ভালো শিক্ষার্থীদের সাথে মেলামেশার যে অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতেই এই বই।

বইটি সব রকমের শিক্ষার্থীদের জন্যই লেখা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, যারা এখন শিক্ষার্থী নন, কিন্তু চাকুরি বা অন্য দরকারে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কিছু শিখতে চান, তাদের জন্যও এই বইটি।



বিদ্যাকৌশল

লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা

বিদ্যাকৌশল

লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা

রাগিব হাসান



আদর্শ

আদর্শ
প্রকাশক মামুন অর রশিদ
২৩ কনকর্ড টাওয়ার (নিচতলা) কাঁটাবন ঢাকা
০১৭১২২৯১৬৪৪ ০১১৯১২৩২৭৭৪ ০১৭৯৩২৯৬২০২
email info@adarshabd.com
Website www.adarshabd.com

বিদ্যাকৌশল : লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা
২য় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৩ এপ্রিল ২০১৬
১ম প্রকাশ মাঘ ১৪২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ মানবেন্দ্র গোলদার
ব্যবস্থাপনা খাইরুল ইসলাম আদর্শ সার্ভিস
মুদ্রণ শিহাব উদ্দিন কর্তৃক আদর্শ প্রিন্টিংস বাংলাদেশে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত
অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adarsha

মূল্য ২৬০ টাকা

Bidya Kaushal: Lekhaporay Ssfalyer Sahaj Formula
by Ragib Hasan
1st Published in February 2016 by Adarsha
23 Concord Tower Kataban Dhaka

Price Tk. 260 :: US$ 20

ISBN 978-984-92066-5-1

উৎসর্গ

যায়ান বাবা আর রিনীতা যোয়ী মা
আমাদের দুই নয়নের মণি
পড়াশোনা করে ভালো দুজন মানুষ হও তোমরা ...

সূচি

মন বসানো মনোযোগ বাড়ানো এবং গুছিয়ে পরিকল্পনা করা

পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা

পড়ার আনুষঙ্গিক বিষয়

অভিভাবকদের জন্য

ভূমিকা

পড়াশোনায় ভালো করতে কে না চায়? আর পড়াশোনা করা কেবল আমাদের শিক্ষাজীবনেরই অংশ নয়; বরং সারাজীবনই আমরা কাজের প্রয়োজনে অথবা অন্য কোনো দরকারে কিছু না কিছু শিখে থাকি বা শেখার চেষ্টা করি।

এই চেষ্টায় কেউ সফল হয়, কেউ আবার পারে না।

কারও জন্য পড়াশোনা করা, ভালো ফলাফল করা, ভালো করে কিছু শেখা খুব সহজ কাজ।

আবার কারও জন্য এটা খুবই কঠিন একটা কাজ।

কিন্তু কেন? মেধা? মেধা একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু একমাত্র ব্যাপার না।

পড়াশোনা করতে গেলে, কিছু শিখতে গেলে কেবল মেধা নয়, এর সাথে সাথে লাগে কিছু কৌশল জানা। ভালো করে শেখার, মনে রাখার এবং বুঝে-শুনে সেটা কাজে লাগানোর কায়দাকৌশল।

এটা যারা জানে, তারা ভালো ছাত্রছাত্রী, অল্প সময়েই পড়া শেষ করে ও শিখে ফেলে তারা পরে পরীক্ষাতেও তা লিখে আসতে পারে, ভালো ফল করে। আর যারা জানে না, তারা অনেক চেষ্টা করেও সে রকম ভালো ফলাফল পায় না।

মেধা জন্মগত বটে, কিন্তু গোপন কথাটা বলে দিই, মেধা কিন্তু কারও ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার প্রধান নিয়ামক না। অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে মেধা একটি মাত্র ফ্যাক্টর। এবং সুখবরটা হলো চেষ্টা দিয়ে, কায়দাকৌশল শিখে মেধার কমতিটা পুষিয়ে নেওয়া অবশ্যই সম্ভব।

এই বইটাতে আসলে ভালো করে সঠিক নিয়মে পড়াশোনা করা, কোনো কিছু শেখার কায়দাকৌশল নিয়েই আলোচনা করেছি, আর এই কায়দাগুলোর নাম দিয়েছি বিদ্যাকৌশল।

ভালো ছাত্ররা এই বিদ্যাকৌশল জানে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এই কৌশলগুলো অন্যদের জানাতে চায় না, অথবা মেধার চেয়ে এই বিদ্যাকৌশলের জোরেই যে তারা ভালো ফলাফল করছে, পাচ্ছে সাফল্য, সেটা তারা জানে না। বইটি লেখার উদ্দেশ্যই হলো সবার জন্য এই পড়ালেখায় ভালো করার কৌশলগুলো গুছিয়ে তুলে ধরা।

আমি নিজে শিক্ষাবিশেষজ্ঞ নই। তবে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমি নিজে ভালো ফলাফল করার সাথে সাথে প্রচুর ভালো ছাত্রছাত্রীর সাথে পড়েছি। এখন শিক্ষক হিসেবে অনেক সময়েই ভালো শিক্ষার্থীদের খুব কাছ থেকে দেখছি। এ বইটি তার ভিত্তিতেই লেখা।

বইটা কাদের জন্য?

বিদ্যাকৌশল বইটি আসলে সব রকমের শিক্ষার্থীর জন্যই লেখা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই এ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। শুধু তা-ই নয়, যারা এখন শিক্ষার্থী নন, কিন্তু চাকরি বা অন্য দরকারে কিছু শিখতে চান দ্রুত এবং কার্যকরভাবে, তাদের জন্যও এ বইটিতে আলোচিত বিদ্যাকৌশল কাজে আসবে।

এই বইটা কীভাবে পড়বেন?

বইটির শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে পড়াশোনার মোটিভেশন আনা এবং সঠিক নিয়মে পড়ালেখা করার গুরুত্ব নিয়ে একনজরে কিছু পরামর্শ দিয়ে। এরপর পড়াশোনা করার প্রস্তুতি পর্বে বলা হয়েছে পড়ার পরিবেশ ও মোক্ষম সময় নিয়ে। শ্রেণিকক্ষে বা লেকচার শুনতে গিয়ে কীভাবে ক্লাসনোট তুলবেন ও এ থেকে উপকৃত হবেন, তা আলোচনা করার পরে শেখার নানা কায়দা, দ্রুত লিখন ও পঠন এবং দ্রুত কোনো কিছু পড়ে বোঝার ওপরে এবং পড়া মনে রাখার ওপরে বেশ কিছু কৌশল উপস্থাপন করেছি। পড়াশোনায় ভালো করতে গেলে মানসিক স্থিরতা এবং মনোযোগ বাড়ানোর বিকল্প নাই, পরের কয়েকটি অধ্যায়ে তা-ই আলোচিত হয়েছে।

পরীক্ষার প্রস্তুতির ওপরে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে পরীক্ষার জন্য গুছিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া এবং পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার দিনে ও পরে কী করতে হবে, তা বলেছি। সবশেষে বলা হয়েছে আলসেমি থেকে বাঁচা এবং হতাশা কাটিয়ে পরীক্ষা-ভীতিকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার কিছু পরামর্শ। বইটি শেষ করেছি অভিভাবকদের জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছি সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, তাদের কাজে আমার অপরিসীম ঋণ, যা কখনোই শোধ হবে না। আশা করি এই বইটির মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন, পড়াশোনা করতে, নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন সাফল্যের সাথে।

সব শিক্ষার্থীর প্রতি রইল শুভকামনা। বিদ্যাকৌশলের প্রয়োগ সফল হোক আপনাদের জীবনে।

ধন্যবাদান্তে

ড. রাগিব হাসান
সহকারী অধ্যাপক
কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামা অ্যাট বার্মিংহাম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
http://www.elochinta.com
http://www.ragibhasan.com
http://www.facebook.com/ragibhasan

বিদ্যাকৌশল
পড়ালেখায় ভালো করা কি শেখার বিষয়

পড়ালেখায় ভালো ফল করতে কে না চায়। কিন্তু কেউ কেউ হাজার চেষ্টা করেও ভালো ফলাফল করতে পারে না, আবার অন্য কেউ অল্প চেষ্টাতেই ভালো ফল করতে থাকে অনায়াসে।

নিজের কিংবা আপনার বন্ধুবান্ধবের কথাই ভাবুন।

কেউ ভোরবেলায় উঠে পড়তে থাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, আবার কেউ সারা দিন আড্ডাবাজি করে রাতে অল্প একটু পড়েই একই ফল পায়।

এর কারণটা কী? এটা কি কেবল মেধা? নাহ্, পুরোপুরি শত ভাগ মেধার ফল না।

অবশ্যই ভালো করে কিছু শেখা অথবা পরীক্ষায় ফলাফল করার পেছনে মেধার ভূমিকা অনেক। কিন্তু মেধা ছাড়াও অনেক কিছু আছে, যা এ ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্যটা তৈরি করে ভালো করতে পারা শিক্ষার্থী আর খারাপ ফলাফল করা শিক্ষার্থীদের মাঝে।

ভালো করে শেখা, ভালো ফলাফল করার রহস্যটা তাহলে কী?

একেবারেই কোনো রহস্য নাই এখানে; বরং এটা হলো কিছু কায়দা, পড়ার কৌশল, শেখার নিয়ম, মনে রাখার পদ্ধতি। এবং অধ্যবসায়। তার সাথে থাকছে সময় ব্যবস্থাপনা, ফলাফল উপস্থাপন করার কৌশল এবং কোনো কিছু পড়ে সহজে বোঝা ও আত্মস্থ করার কিছু কায়দা।

যারা এই ব্যাপারটা ধরতে পারে, তারা সহজেই অল্প সময়ে যেকোনো কিছু বুঝে ফেলে, সেটা শিখতে পারে, পরীক্ষায় লিখতে পারে এবং ভালো ফল করতে পারে। যারা পারে না, তারা অনর্থক ব্যয় করে ফেলে অনেক সময়।

এ ব্যাপারটা আসলে জাদুমন্ত্রের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু আসলেই নিয়ম করে, পদ্ধতিগতভাবে শেখা সম্ভব যেকোনো কিছুই। কেবল জানতে হবে শেখার কায়দাটা।

এই কায়দাটাই বিদ্যাকৌশল। তথাকথিত ভালো ছাত্ররা মেধা ছাড়া আর যে কারণে পড়ালেখায় ভালো করে, তা হলো এই বিদ্যাকৌশলের কায়দাগুলো সচেতন বা অবচেতনভাবেই অনুসরণ করে চলা।

প্রথম পদক্ষেপ : নিজেকে পরিবর্তন করার প্রতিজ্ঞা

আপনি এ বইটি পড়ছেন, তার মানে ধরে নিচ্ছি আপনি পড়ালেখায় ভালো করতে আগ্রহী, জানতে চান, শিখতে চান অনেক ভালো করে, আর তার সাথে সাথে হয়তো পরীক্ষাতেও করতে চান ভালো ফলাফল।

তার প্রথম ধাপটা কিন্তু খুব সহজ। আপনাকে দুইটা কাজ করতে হবে।

১. আপনাকে দিয়ে হবে না, আপনার মাথায় কিছু নাই, অন্যের চেয়ে আপনার বুদ্ধি মেধা কম, এ কথাগুলো পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে।

২. নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য করতে হবে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

আপনি নিজে যদি না চান অথবা নিজের ওপরে আস্থা না রাখেন, তাহলে দুনিয়ার হাজার ভালো শিক্ষক, সেরা টিউটোরিয়াল, নম্বর ওয়ান স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি— এরা কেউই আপনার পড়ালেখার কিছুই পাল্টে দিতে পারবে না।

তাই বিদ্যাকৌশলের প্রথম ধাপ হিসেবে এই কাজটা করুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওপরের দুটি প্রতিজ্ঞা করুন— বলুন, 'আমি অন্য কারও চেয়ে কম নই' এবং 'আমি আমার পড়ালেখার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েই দেখাব।'

ব্যস, প্রথম পদক্ষেপটি নিয়ে ফেলেছেন। হাজার মাইলের পদযাত্রার শুরুটা কিন্তু একটি পদক্ষেপ দিয়েই (A journey of a thousand miles, begins with a single step)। সেরকম পড়ালেখায় ভালো করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্রথম ধাপটি।

নিজের ওপরে বিশ্বাস আনুন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন। আপনাকে ঠেকাবে, এমন সাধ্য কি কারও আছে?

পড়ার মোটিভেশন

পড়ে কী হবে?

পড়ালেখায় ভালো করার জন্য সবার আগে আপনার মোটিভেশনটা আনতে হবে, নিজের মনে ঢোকাতে হবে পড়ে কী হবে সেই প্রশ্নের উত্তর।

আপনি কি কেবল ক্লাসে ভালো করা, সার্টিফিকেটের জন্য পড়েন? কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সত্যি বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ার উদ্দেশ্য হলো কেবল কাগুজে সার্টিফিকেট নয়; বরং নিজের মনেরই উন্নতি ঘটানো, নিজের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করা।

সবকিছুতে ভালো লাগবে না, এটা স্বাভাবিক : পড়তে ভালো লাগে না, অনেক শিক্ষার্থীরই এই অভিযোগ। জীবনের সবকিছু কিন্তু 'ভালো লাগা'র জন্যই আমরা করি না; বরং করি দরকার আছে বলে। এবং সে জন্যই পেশাগত জীবনে মানুষ ভালো না লাগলেও অফিসে যায়। কারণ না গেলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। পড়া ভালো না লাগলেও আপনার উদ্দেশ্য যেটা, পরীক্ষায় পাস কিংবা কোনো বিষয়ে ভালো করে জানা, তার জন্য আপনাকে পড়তে হবেই, এটা মাথায় ঢুকিয়ে নিন।

কেন পড়তে বসবেন এক্ষুনি? কারণ সময়ের কাজ সময়ে করে আপনি পড়াটাকে এগিয়ে রাখতে পারবেন, না করলে পরীক্ষার আগে বিশাল সিলেবাস নিয়ে খাবি খেতে হবে, সমস্যা আরও বাড়বে। কাজেই নিজের স্বার্থেই এখনই পড়তে বসুন।

পড়ার মোটিভেশন বাড়াবেন কী করে?

পড়ার মোটিভেশনের গুরুত্ব না হয় বুঝলেন, কিন্তু কী করে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াবেন, পড়ার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করবেন? কয়েকটা কায়দায় এটা করতে পারেন—

১. আপনি কেন পড়ছেন তা লিখে ফেলুন : হতে পারে, আপনাকে পড়তে হবে পরীক্ষায় পাসের জন্য, অথবা কিছু শেখার জন্য। কেন পড়ছেন, সেটা শুরুতেই লিখে ফেলুন কাগজে-কলমে। আপনার আসল লক্ষ্যটা কী? স্পষ্ট ভাষায় লিখে ফেলুন, আপনি আসলে কিসের জন্য পড়ছেন। উদাহরণ— 'আমার লক্ষ্য হলো পরীক্ষায় পাস করা'। 'আমার লক্ষ্য হলো পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়া'। 'আমার লক্ষ্য হলো অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের তমুক বিভাগে ভর্তি হওয়া'। 'আমার লক্ষ্য হলো সি প্রোগ্রামার হওয়া'। 'আমার লক্ষ্য হলো ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের ওপরে দক্ষ হওয়া'। লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদে কী, দুইটাই লিখে ফেলুন। লক্ষ্য যা-ই হোক, কাগজে-কলমে সেটা লিখে ফেললে চোখের সামনে সেটা আসে, আর বারবার সেই লক্ষ্যের দিকে তাকালে পড়ার জন্য মোটিভেশন পাবেন। আর আসলে কী আপনার লক্ষ্য, তা সুস্পষ্টভাবে লেখার কাজটা করতে গেলে আপনার নিজেরও ধারণাটা পরিষ্কার হবে।

২. নিজেকে পুরস্কার দেওয়ার অভ্যাস করুন : মুলা থিওরি কেবল গাধার জন্য না, মানুষের ওপরেও খাটে। পড়াশোনা ঠিকমতো করে করতে পারলে আপনি নিজেকে নিজেই কী পুরস্কার দেবেন, সেটা ঠিক করে রাখেন। এর পর সেই পুরস্কারের লোভে পড়ে হলেও আপনার মনে পড়াশোনা করার জন্য কিছুটা মোটিভেশন আসবে।

৩. সমুদ্র নয়, জলকণা : পড়াকে বিশাল সমুদ্র মনে না করে ছোট ছোট জলকণার সমাহার হিসেবে দেখুন। সিলেবাস খুবই বড় মনে হলে সেটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিন। তার পর প্রথম ভাগটা পড়া শুরু করে দিন। দরকার হলে ঠিক করুন, একবারে একদিন পড়বেন তা না; বরং ১৫ মিনিটে যা পড়তে পারবেন, সেরকম করে ছোট ছোট ভাগ করে নিন।

সবশেষে এটাই বলব, চোখ বন্ধ করে একবার স্বপ্ন দেখুন, আপনার লক্ষ্যটি ভালোভাবে অর্জন করতে পারার পরে আপনার মনে কী অনুভূতি হচ্ছে। হতে পারে, পরীক্ষায় পাস করেছেন, অথবা জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন কিংবা কোনো একটি জটিল বিষয় ভালো করে রপ্ত করেছেন। সেটা করার পরে যে অনুভূতিটা হবে, আগাম সেটা কল্পনা করুন, আর সেই সুখানুভূতির জন্য হলেও পড়ার মোটিভেশন খুঁজে নিন।

ভালো ছাত্র হবার পরিকল্পনা

শুরুতেই একটা ব্যাপার খোলাসা করে রাখি। এই বইয়ের কৌশলগুলো কিন্তু কেবল 'উচ্চ নম্বরের সিঁড়ি' নয়; বরং এর লক্ষ্য হলো ভালো করে যেকোনো কিছু শেখার কৌশল এবং পরবর্তী সময়ে তা যাচাইমূলক যেকোনো কিছুতে সাফল্যের কিছু পরামর্শ সবার কাছে তুলে ধরা। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেলেই কেউ ভালো ছাত্র হয় না; বরং শিক্ষার আসল লক্ষ্য হলো জানার পরিধিটাকে বাড়ানো, দক্ষতা ও জ্ঞানের সীমাটা বাড়ানো।

এ ব্যাপারটা যদি আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে চলুন শুরু করা যাক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বইয়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা দেখব, কী করে ধাপে ধাপে ভালো ছাত্রছাত্রী হওয়া সম্ভব। বিদ্যাকৌশলের এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে আমরা ভাগ করব নিচের কয়টি ধাপে—

১. আত্মবিশ্লেষণ : আপনার নিজের অবস্থাটা কী? সেটা জানা ও বোঝা। এই ধাপে নিজের পড়াশোনার অবস্থাটা কী এবং আপনি কী চান, সেটা ঠিকমতো বুঝতে হবে।

নিজের অবস্থা বোঝার পরে কেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আপনি পাচ্ছেন না, তা বুঝতে হবে। আপনার কি পড়ায় মন বসে না? নাকি পড়েও বুঝতে পারেন না? নাকি বুঝলেও মনে থাকে না? অথবা মনে থাকলেও পরে অন্যকে বোঝানো বা পরীক্ষায় লিখতে পারেন না?

নিজেকে জানার পরেই কেবল আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কোন দিকে দিতে হবে মনোযোগ।

২. প্রস্তুতি : এই পর্বে আপনার সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। পড়ার কায়দা, পড়ার বিষয়বস্তু গুছিয়ে নেওয়া এবং কার্যকর পরিকল্পনা করার অভ্যাস গড়ে নিতে হবে।

৩. পড়াশোনা করার কৌশল : শেখার কৌশল, মনে রাখার কৌশল, এসব শিখতে হবে এই পর্যায়ে।

৪. কিছু আত্মোন্নয়ন : নিজের কিছু দক্ষতা বাড়াতে হবে এই ধাপে, যেমন দ্রুত পড়া, দ্রুত লেখা এবং গুছিয়ে লেখার কৌশল।

৫. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা : শ্রেণিকক্ষে কীভাবে সবচেয়ে ভালো করে শিখবেন, তার কৌশল রপ্ত করবেন।

৬. পরীক্ষার প্রস্তুতি : পরীক্ষার জন্য কী করে প্রস্তুত হতে হবে, কেমন করে পরীক্ষার সময় কাজ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাবেন, সেটা শিখতে হবে।

৭. পড়াশোনার আনুষঙ্গিক কিছু কায়দা : যেমন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

এ কয়েকটি ধাপে পরিকল্পনা মতো এগোলে আপনি অবশ্যই আপনার পড়াশোনার অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবেন।

ভালো করে পড়া ও বোঝা

সঠিক নিয়মে পড়াশোনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো মোক্ষমভাবে এবং সুদক্ষভাবে পড়াশোনাটা করা। বেশিক্ষণ বা বেশি বেশি পড়ার মানেই কিন্তু ভালোভাবে বোঝা না। আমার দেখা অনেক ছাত্র দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত, কিন্তু তাদের এই অনেক সময় দেওয়াটা কাজে এসেছে অল্পই। কারণটা খুব সহজ : ইনফরমেশন ওভারলোড। আমাদের মাথার গ্রহণক্ষমতা, ধারণক্ষমতা সীমিত। আর অনেক অনেক পাঠকে ঘ্যান ঘ্যান করে পাখি পড়ার মাধ্যমে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করলে সেটা মাথায় ঢুকবে বটে, কিন্তু বেরিয়েও যাবে। ভালো করে পড়তে বা বুঝতে হলে আসলে সুদক্ষ বা এফিসিয়েন্টভাবে পড়াশোনার কাজটা করতে হবে। আসুন, দেখা যাক কী করা যায়—

১. ছোট ছোট ধাপে শেখা : এক ধাপে ১০০ পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করাটা খুবই কঠিন। এর চেয়ে পড়াটাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে নিন।

২. দলেবলে পড়া : অনেক সময় একা পড়ার চেয়ে সবাই মিলে পড়লে এবং তার পাশাপাশি একজন পড়ে আরেকজনকে শেখালে সহজে শিখতে পারা যায়। কাজেই দুই বা তিনজন মিলে গ্রুপ করে পড়ুন।

৩. দেখে না শুনে শিখেন আপনি? : কেউ কেউ ছবি দেখলে সহজে শেখে, আবার কেউ কানে শুনলে শিখতে পারে। আমি নিজে প্রথম গোত্রের— কোনো লেকচার শুনে কখনো কিছু শিখতে পারি নাই, কিন্তু ব্যাপারটা নিজে পড়ে বা দেখে সহজে শিখেছি। আপনি কীভাবে ভালো শেখেন, সেটা ভেবে দেখুন তো? তার পর সেভাবেই পড়াশোনা করুন।

৪. নিজেকেই নিজে পড়া দিন : পড়ে বুঝতে পেরেছেন কি? পড়া দেওয়ার মতো কেউ না থাকলে এক কাজ করুন— মোবাইল ফোনটা বের করে

ভয়েস রেকর্ডার চালু করুন, আর নিজেই নিজেকে পড়াটা বোঝান। তারপর রেকর্ডিং বন্ধ করে শুনে দেখুন, কেমন শোনায় আপনার নিজের পড়াটা।

৫. অনুশীলন, অনুশীলন, অনুশীলন : পড়া পেরেছেন, অঙ্ক করতে শিখেছেন কি না, তা বোঝার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো অনুশীলনের ওপরে থাকা, সেটা না করলে একেবারেই চলবে না। কাজেই সারা দিন শেষে একবার প্র্যাকটিস করবেন, সেই চিন্তাটা বাদ দিন, ঘন ঘন অনুশীলন করেন। দরকার হলে একটু পড়েই তার পর অল্প এবং ঘণ্টা খানেক পরে আরেকটু বেশি— এভাবে।

সঠিক নিয়মে লেখাপড়া

আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন সেবা প্রকাশনীর একটা বই ছিল 'সঠিক নিয়মে লেখাপড়া' এই নামে। জানি না এখনো বইটা চলে কি না, তবে সঠিক নিয়মে পড়ালেখা করার দরকারটা এখনো ম্লান হয়ে যায়নি।

লেখাপড়া করাটাও কি শেখার ব্যাপার? অবশ্যই। খেয়াল করে দেখবেন, অনেকে সারা দিন বইপত্র নিয়ে পড়ে থেকেও ভালো ফল করতে পারছে না, আবার অনেকে হালকা-পাতলা পড়া দিয়েই ভালো ফল পাচ্ছে।

কারণটা কী? কারণ হলো পরের দলের শিক্ষার্থীরা সহজে পড়ে আত্মস্থ করার সূত্রটা ধরে ফেলেছেন।

আমি শিক্ষাবিদ নই। তবে নিজের শিক্ষাজীবনে যা করে ফল পেয়েছি, তার হিসেবে বলতে পারি, একটা কিছু নিয়ম কিন্তু আছে ঠিকই।

১. পড়ার সর্বোত্তম সময়: শুরুতেই আপনার পড়ার সবচেয়ে কার্যকর সময়টা বুঝে নিতে হবে। কেউ কেউ কাকডাকা ভোরে পড়তে পছন্দ করেন, আবার কেউ একেবারে গভীর রাতে। এখানে কিন্তু ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। 'মাই ডেইলি লাইফ' রচনার মতো সকাল পাঁচটায় উঠে পড়তে বসার এই মিথ থেকে বেরিয়ে আসুন, সকালে পড়তে যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে হাতকড়া পরিয়ে টেবিলে বসালেও আপনার মাথায় কিচ্ছু ঢুকবে না। অন্যদের 'বিজ্ঞ' কথা শোনা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করেন, কখন মাথাটা কাজ করে। আমার কয়েক বন্ধু ভোরবেলা উঠে পড়ে দেখে আমিও দুদিন চেষ্টা করেছিলাম। ঘুম গেছে, মাথা ধরেছে, কিন্তু এক ফোটা পড়াও মাথায় ঢোকেনি। কাজেই ভোরে পড়তে হবেই, এই আদিকালের চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসেন।

২. নোট লিখুন, হিজিবিজি লিখুন : বই বা নোটখাতা খুলে গড় গড় করে মুখস্থ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারেন, কিন্তু সেটা খুব ইনেফিশিয়েন্ট উপায়; বরং মনে রাখার কার্যকর উপায় হলো অল্প কিছুক্ষণ পড়ার পরে কতটুকু মনে আছে, সে ব্যাপারে কিছু লেখা। মাথায় ঢোকানোর পরে যদি এ কাজটা না করেন, তাহলে এক কান দিয়ে ঢুকে পালিয়ে যাবে অন্য কান দিয়েই সব পড়া, সব লেখা। তাই খাতাটা সামনে নিয়ে পড়তে বসেন, পাঁচ মিনিট পরে পরে কী শিখলেন লেখেন যতই হাবিজাবি হিজিবিজি হোক না কেন। একবার লেখা অন্তত ১০ বার পড়ার চেয়ে ভালো।

৩. পড়ার ভঙ্গি : পড়ার জন্য কি 'পরিবেশ' লাগে? আসলে একেক জনের একেক রকম। কেউ কেউ অনেক শব্দের মাঝেও দুনিয়ার ভলিউম অফ করে পড়তে পারে অনায়াসে। আর কেউ আবার অল্প শব্দ হলেও 'কে শব্দ করে' বলে পড়া থেকে উঠে হম্বিতম্বি করে। নিজের পড়ার কোন পরিবেশ কাজ করে ভালো, সেটা বের করে নিন। সবাইকে পড়ার টেবিলে বসে পড়তে হবে এমন কথা নাই। আমি নিজে কখনো সোজা হয়ে টেবিলে পড়তে পারিনি, বিছানায় কাত হয়ে না বসলে আমি পড়তে পারি না। নিজের ভঙ্গি, পরিবেশ, সেটা বুঝে নিয়ে পড়তে বসেন।

৪. বিরতি নিন : একটানা দিনে ১০ ঘণ্টা পড়ে 'ফাটিয়ে ফেলা' আসলে আপনার কপালটাকেই ফাটিয়ে ফেলার নামান্তর। কাজেই প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার করে ব্রেক নিন। তবে সেই ব্রেক আবার ফেসবুকে ঘুরে কাটাবেন না, সেখানে একবার ঢুকলে বেরোনো অনেক কঠিন।

৫. টোটাল ইমারশন : মানে হলো পুরাপুরি ঝাঁপিয়ে পড়া একটা বিষয়ে। এটা আমার প্রিয় টেকনিক ছিল। আমরা যতই মাল্টিটাস্কিংয়ের কথা বলি না কেন, আমাদের মাথা আসলে একবারে একটা কাজই ভালো পারে। কাজেই একবারে একটা সাবজেক্টই ভালো করে পড়ুন।

৬. পড়া দিন : নিয়মিতভাবে কাউকে পড়া শোনান। বন্ধু হতে পারে, শিক্ষক হতে পারে, বা বাবা-মা, কিন্তু পড়া দেওয়া, কী পড়েছেন মুখে বলার মাধ্যমে অনেক ভালো করে পড়াটা বোঝা সম্ভব। সামনে কেউ না থাকলে অন্তত নিজের মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে তার কাছেই পড়া দিন।

মাথার অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়াকে মুখ পর্যন্ত আনতে হলে আপনার মনের অজান্তেই ব্যাপারটা অনেক ভালো করে হবে বোঝা। তাই পড়া দিন, নিয়মিত।

৭. **ভূমিকা বাদ দিন:** পড়ার চেয়ে পড়ার আয়োজনকে বেশি বানিয়ে ফেলবেন না, ভূমিকা বাদ দিয়ে পড়া শুরু করে দিন, এক্ষুনি!

শিক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা রইল।

পড়ার প্রস্তুতি
পরিবেশ ও সময়

পড়ার পরিবেশ

বাংলা সিনেমাতে মেধাবী কিন্তু গরিব নায়ক কীভাবে পড়ে দেখেছেন কি? রাস্তার আলোয় মহা কোলাহলের মধ্যে পড়ছে। আবার বিদ্যাসাগরের কাহিনিও চালু, ল্যাম্পপোস্টের হালকা আলোয় বসে পড়াশোনা করে তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি তো বাংলা সিনেমার নায়কও নন, বিদ্যাসাগরও নন। তাহলে পড়ার পরিবেশ কেমন করে সৃষ্টি করবেন?

শুরুতেই এটা মাথায় ঢুকিয়ে নিন খুব ভালো করে, পড়ার পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু পড়ার পরিবেশ নাই বলে পড়তে পারছেন না এটা খুবই ফালতু একটা অজুহাত, পড়া ফাঁকি দেওয়ার জন্য আপনার মন এটাকে আঁকড়ে ধরছে। যেকোনো পরিবেশেই আসলে যে কেউ পড়াশোনা করতে পারে। পরিবেশের চেয়ে আপনার মনটাই এখানে আসল ব্যাপার। পড়ার পরিবেশের অজুহাতে পড়ায় ফাঁকি দেবেন না, সেটা আগে ঠিক করে নিতে হবে। তাহলে পড়ার পরিবেশ নিয়ে শত ভাগ মাথা ঘামানো বাদ দিয়ে সেই সময়টা আসল পড়ায় লাগাতে পারবেন।

তবে ভালো পরিবেশে পড়া ভালো হয়, তা বটে। দেখা যাক, কী কী ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে!

কোথায় পড়বেন?

আপনি কি অনেকের মাঝে পড়তে পারেন? অন্য সবকিছু, শব্দ, কথা এগুলোকে ফিল্টার করে দিয়ে দিতে পারেন পড়ায় মনোযোগ? যদি পারেন, তাহলে লাইব্রেরি, ক্লাস, এমন সব জায়গাতেই পড়তে পারবেন। আর যদি না পারেন, তাহলে পড়ার জন্য মোটামুটি শব্দ কম এমন জায়গা খুঁজে নিন। আলাদা রুম লাগবেই এমন কোনো কথা নাই। আসলে আপনার দরকার এমন জায়গা যেখানে—

১. আপনার পড়ায় বাগড়া দিতে কেউ আসবে না, দুই মিনিট পর পর ডাকাডাকি করতে থাকবে না,

২. আশপাশের গল্প, টিভি, আড্ডায় আপনার মন ছুটে যাবে না পড়া থেকে।

এই দুইটা মূল শর্ত মেটাতে পারে এমন যেকোনো জায়গাতেই পড়তে পারেন।

বারবার উঠতে যাতে না হয়, সেই সুবিধা কি আছে? পড়া থেকে বারবার যাতে উঠতে না হয়, সে জন্য যা করার দরকার তা করে নিন। খাওয়ার দরকার হলে হালকা খেয়ে পড়তে আসেন। বাথরুম, জরুরি ইমেইল/মেসেজ/ফোন, সব সেরে নিন। তার পরে পড়তে বসেন, এমনভাবে বসেন, যাতে করে উঠে পড়ার অজুহাত না আসে।

আলো

পড়ার জন্য খুবই দরকারি ব্যাপার এটা। পড়ার জায়গাটায় যথাযথ আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটা কায়দা হলো রুমটাকে অন্ধকার করে টেবিলে এমন একটা ল্যাম্প দেওয়া, যাতে করে আপনার চোখে আলো না আসে, কিন্তু আলোটা টেবিলের সবকিছুকে আলোকিত করে দেয়। পড়ায় ফোকাস করার জন্য এটা খুব কাজে দেয়।

পড়ার স্থান, পড়ার জায়গা

টেবিলে বসেই কি পড়তে হবে? নাহ্, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কেউ কেউ চেয়ার-টেবিলে না বসলে পড়তে পারেন না। আবার আমার মতো কেউ কেউ আছেন, যারা বিছানায় কাত হয়ে আধশোয়া কিংবা পুরোপুরি না শুয়ে পড়তে পারেন না। দুই রকমের পড়ার কায়দাতেই কোনো সমস্যা নাই, যদি কাজ হয়। আপনার কোন ভঙ্গিতে পড়তে ভালো লাগে, পড়া ভালো হয়, দুই পদ্ধতিই কাজে লাগিয়ে দেখে নিন।

শব্দ

শব্দে কি এলার্জি আছে? পুরোপুরি নিঃশব্দ পরিবেশে পড়ার অভ্যাস যদি থাকে, তাহলে আপনার উচিত হবে সেরকম পরিবেশ বানিয়ে নেওয়া, দরজা-জানালা বন্ধ করে। আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলেও কিন্তু

উপায় আছে। Noise canceling headphone ব্যবহার করেন, আর কোনো white noise-এর অডিও জোগাড় করে সেটা ছেড়ে রাখেন। তাহলে কিন্তু লাইব্রেরির বা হলের হট্টগোলের মাঝেও পড়তে পারবেন মনোযোগ দিয়ে। আবার অনেকে পুরোপুরি নিঃশব্দ পরিবেশে পড়তে পারেন না। তারা হালকা রিলাক্সিং মিউজিক ছেড়ে দিয়ে পড়তে পারেন।

পড়ার মোক্ষম সময় কোনটা

কোন সময়ে পড়লে সবচেয়ে ভালো পড়া হয়? এ প্রশ্নের জবাব আসলে একটা নয়; বরং একেক জনের জন্য একেক রকম। আসল ব্যাপার হলো যে সময়ে আপনার মনোযোগ সবচেয়ে বেশি থাকবে, সে সময়েই পড়া। এর পাশাপাশি আপনি কি 'সকালবেলার পাখি' (morning bird) নাকি রাতজাগা পেঁচা (night owl), সেটাও বিবেচ্য। সকালে ওঠার অভ্যাস যদি থাকে, তাহলে কাকডাকা ভোরে উঠে পড়া অনেকের ভালো হয়। আবার অনেকে রাত জেগে পড়তে পারে, কিন্তু সকালে পারে না।

সকালে পড়ার সুবিধা

ভোরে উঠে পড়তে বসার বড় সুবিধা হলো রাতে ঘুমানোর ফলে দেহমনে ক্লান্তি না থাকা। পাশাপাশি শব্দও কম থাকে, অন্তত সকাল সাতটা বা আটটা বাজা পর্যন্ত। টেলিভিশনে বোরিং সব প্রোগ্রাম প্রচার হয় বলে সেদিকে সময় নষ্ট হওয়ার সুযোগ কম। আবার ইন্টারনেটে আপনার বন্ধুবান্ধব এ সময়টাতে কম থাকবে, তাই সেখানে আড্ডাতেও সময় নষ্ট হবে না।

রাতে পড়ার সুবিধা

রাতে স্বভাবতই শব্দ কম থাকে। চারদিক চুপচাপ, তাই মনোযোগ দেওয়া সহজ। আবার সারা দিন যা পড়েছেন, তা সহজে মনে রাখাও হয় সম্ভব, তাই সারা দিনের পড়াকে রিভিউ করার মোক্ষম সময় রাতের বেলা। তবে সমস্যা হলো রাত জাগার অভ্যাস না থাকলে পড়ার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। আর সকালে কাজ থাকলে রাত জেগে পড়ার প্রভাব পরদিন পুরাটাই ভোগ করতে হবে।

নানা কাজের মোক্ষম সময়

পড়ার জন্য একেক জনের পছন্দ তো একেক রকম, কিন্তু সাধারণভাবে সবার জন্য খাটে এমন কি কিছু আছে? বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা

করেছেন নানা সময়ে। তাদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, দিনের সব সময় কিন্তু আমাদের মনোযোগের জন্য সমান কার্যকর না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আস্তে আস্তে মনোযোগ দেওয়া ও বোঝার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ১০টা-১১টার দিকে সবচেয়ে ভালো অবস্থা থাকে। কিন্তু দুপুর একটার পর থেকে পড়াশোনা করার অবস্থার বারোটাই বেজে যায়, মাথায় এ সময়টায় সহজে কিছু ঢোকানো বশ কঠিন। বিশেষ করে দুপুরের খাবার খাওয়ার পরে মাথা পুরোই অচল হয়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষের। ভাতঘুম বলে যে কথাটা চালু আছে, তা কিন্তু ভুল না। খেয়াল করে দেখবেন, সকালের দিকে এ পড়া সহজে বুঝতে পারছেন, দুপুরের পরে কিন্তু মাথায় সেটাই সহজে ঢুকছে না।

বিকাল চারটা-পাঁচটার দিকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজটা ভালো হয়। ফলে যেসব কাজ গৎবাঁধা পরিশ্রম ধরনের, সেটা এ সময়ে করতে পারেন। সন্ধ্যা পেরোলে রাত আটটার পর থেকে মানুষের মনের সৃজনশীল অংশটা ভালো কাজ করে। ফলে যেসব পড়াশোনার জন্য চিন্তা করা দরকার, নতুন কিছু লেখার/করার দরকার হয়, সেটা রাতেই করা ভালো।

স্কুল-কলেজের ক্লাসের মাঝে পড়ার সময় বের করা

নানা রকমের পড়াশোনার জন্য ভালো সময় কোনটা, তা না হয় ওপরে আন্দাজ পেলেন, কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা কী করবেন? স্কুল বা কলেজের ক্লাসের সময়সূচির ওপরে তো তাদের সময়টা নির্ভর করে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পরামর্শ হলো সারা দিনে ছোট ছোট ঘুম বা ন্যাপ নেওয়ার অভ্যাস করা। স্কুল বা কলেজের ক্লাস শেষে বাসায় বা হলে ফিরে খেয়ে নিয়ে চট করে আধা ঘণ্টার ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে ফেলেন। মাথাটা রিসেট হবে, রাতের ঘুমের অভাব না মিটলেও অন্তত দেহমন সবটাই তাজা হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে যেটা করেছি একসময়ে সেটাই বলি— কলেজে পড়ার সময়ে সকাল বেলা কলেজে চলে গিয়ে ফিরতাম বিকাল ছয়টার দিকে, তক্ষুনি ঘণ্টা খানেকের হালকা ঘুম দিয়ে রাত সাড়ে আটটার দিকে আবার পড়তে বসার সময় পেতাম। ফলে ক্লাসের ব্যস্ততা সত্ত্বেও পড়ার সময় বেড়ে যেত অনেকটা, কারণ রাতে যখন পড়তে বসতাম, মাথাটা তখন বেশ চালু থাকত। কাজেই ছোট ছোট ১০-১৫ মিনিট কিংবা ঘণ্টা খানেকের ঘুম দেওয়ার অভ্যাস করুন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা লাভ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা

কীভাবে লেকচার শুনবেন ও অংশ নিবেন

ক্লাসে অংশগ্রহণ ভালো করে পড়ালেখা করার একটা অপরিহার্য অংশ। অবশ্য আমাদের দেশে ক্লাসে প্রশ্ন করাকে খুব ভালো চোখে দেখা হয় না। সহপাঠীরা হয়তো আতেল খেতাব দেবে, আর অনেক সময় এমনকি শিক্ষকেরাও বেয়াদব ভাবতে পারেন। কিন্তু ক্লাসে লেকচারের সময়ে যদি বুঝতে পারছেন না এমন কিছু নিয়ে প্রশ্ন না-ই করেন, তাহলে বুঝবেন কী করে? তাই লজ্জার মাথা খেয়ে ফেলেন সুরুত করে, আর মনে যা প্রশ্ন আসে, নাহি ভয় নাহি লাজ-এর সাথে সেই প্রশ্নটা করে ফেলেন।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোর্স পড়াই, তখন কোর্সের গ্রেডের একটা অংশ বরাদ্দ করি ক্লাসে অংশগ্রহণের ওপর। মানে ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করছে কি না, অথবা জবাব দিচ্ছে কি না, তার ওপরে ভিত্তি করে শিক্ষার্থী কিছু নম্বর পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এরকমের ইন্টারএকটিভ লেকচার একমুখী লেকচারের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। শিক্ষকেরা বলবেন, আর ছাত্ররা কেবল শুনবে, এরকমের লেকচারের পড়াটা শিক্ষার্থীদের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তাহলে আপনার কী করণীয়? ক্লাস থেকে ভালো করে পড়া বুঝে নিতে হলে আপনাকে বেশ কয়েকটা কাজ করতে হবে। আসুন, দেখা যাক—

ক্লাসের প্রস্তুতি

ক্লাসে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে যান। খুব বেশি সময় দিতে হবে না। মোটামুটি কয়েক মিনিটে চট করে চোখ বুলিয়ে নিন এই ক্লাসে যা যা পড়ানো হতে পারে। সেখান থেকে মূল বিষয়বস্তু বা কিওয়ার্ডগুলোর তালিকা করে নিন। এই ক্লাসের যে নোটখাতা আছে, সেখানে এগুলো লিখে রাখুন।

এর মধ্যে কোন কোন টপিক নিয়ে প্রশ্ন মনে আছে, তা নোট করে রাখুন, দরকারমতো ক্লাসে শিক্ষককে প্রশ্ন করবেন। ক্লাসের বিষয়গুলো কোন কোন পাঠ্যবইয়ে থাকতে পারে এবং আনুষঙ্গিক অন্য কোন কোন সাইট থেকে পড়ার দরকার হতে পারে, তা-ও এই প্ল্যানিং শিটে লিখে নিন।

প্ল্যানিং শিটের একটা নমুনা নিচের ছকে দেওয়া হলো।

তারিখ	দিন তারিখ এখানে লিখুন।
বিষয়	কোন সাবজেক্টের কোন বিষয়/অধ্যায় এর উপরে ক্লাস।
কিওয়ার্ড/বিষয়তালিকা	এখানে লিখে রাখুন কী কী বিষয় পড়ানো হতে পারে বা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
শিক্ষকের জন্য প্রশ্ন	শিক্ষককে কোন কোন প্রশ্ন করতে পারেন তা এইখানে লিখে রাখেন।
কোন কোন বই/ অধ্যায় পড়তে হবে?	এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তার তালিকা এখানে লিখুন।

ক্লাসে আপনার কর্তব্য

ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসে শিক্ষকের কাছে গুডি গুডি বয় সেজে থাকতে হবে তা বলব না মোটেও। তবে কোনো ক্লাসে লেকচার থেকে ভালো করে শিখতে হলে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে বইকি। প্রথম বেঞ্চে না বসেও সেটা দেওয়া যায়। শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন, তার প্রতিটি শব্দ হুবহু তুলতে হবে তার দরকার নাই। তবে শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন তা মোটামুটি নিজের ভাষায় লিখতে হবে। ছবি জাতীয় কিছু যা পারেন তুলে রাখেন। কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে শিক্ষককে প্রশ্ন করুন। অধিকাংশ শিক্ষকই প্রশ্ন পেলে বিরক্ত হন না; বরং আগ্রহের সাথেই জবাব দেন।

তবে খেয়াল রাখবেন, কেবল প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করা ঠিক না, আসলেই কৌতূহলী হলে তবেই প্রশ্ন করুন। ক্লাস শেষের দিকে প্রশ্ন করে শিক্ষককে ক্লাস শেষের সময়টাতে আটকে রাখলে আপনি গণশত্রু হয়ে পড়তে পারেন, কাজেই সময় বুঝে প্রশ্ন করুন।

ক্লাসে কিছু না বুঝলে পরে বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, কেউ সেটা বুঝেছে কি না। এটা করার মানে কিন্তু আতলামি করা না; বরং নিজেদের ভালোর জন্যই এটা করা দরকার। প্রয়োজনে ভালো লেকচার তুলেছে এমন কারও লেকচার কপি বা ছবি তুলে নিন ক্লাস শেষের সাথে সাথেই। পরে আপনার ক্লাসনোটকে উন্নত করুন এই লেকচার থেকে তথ্য নিয়ে।

ক্লাসনোট লেখার গুরুত্ব

কোনো কিছু ভালো করে বুঝতে চান, কিন্তু নিজে নিজে পড়ে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কিন্তু ক্লাসে যা পড়েন তার সবটাই মাথা থেকে হয়ে যায় গায়েব? উপায় কী?

উপায় আছে, আর তা হলো একটু কষ্ট করে ক্লাসনোট তোলা। ক্লাসেই। ফটোকপির দোকানে না।

আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমার এক বন্ধুর দায়িত্ব ছিল ক্লাসে সবার জন্য ক্লাসনোট তোলা। নানা কালির কলম দিয়ে, সচিত্র, স-ধারাভাষ্য ('স্যার এটা বলার সময়ে ডান হাত নাড়লেন, কান চুলকালেন' ইত্যাদি) এবং মুক্তার মতো হাতের লেখায় হতো সেই ক্লাসনোট। বাকি সবার দায়িত্ব ছিল সেমিস্টারের শেষে সেটা ফটোকপি করে নেওয়া।

কিন্তু পরে বুঝলাম, এটা বড় একটা ভুল ছিল। কেন?

আপনার হাতের লেখা হয়তো মুক্তার মতো না। কাকের বাম ঠ্যাঙের মতো।

আপনার হয়তো কেবল কালো রঙের বলপেনটাই সম্বল।

ক্লাসনোট তুললে সেটা আপনি ছাড়া আর কারও পক্ষে পড়া সম্ভব না।

কিন্তু তাতে কী?

ক্লাসনোট কী তুলছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আপনার মুক্তোহস্ত বন্ধুর হাতের ক্লাসনোট অবশ্যই আপনার কাকস্য-ঠ্যাঙস্য আঁকিবুঁকির চেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও পাঠযোগ্য হবে।

কিন্তু আপনি ক্লাসনোট তোলার সময়ে যে কাজটা করছেন, সেটাই এখানে দরকারি।

সেটা কী? সেটা হলো ক্লাসের লেকচার শোনার সাথে সাথে সেটাকে মাথার মধ্য দিয়ে শোনা-বোঝার অংশ থেকে লেখার অংশ দিয়ে প্রবাহিত করে হাত দিয়ে লেখা। এই যে তথ্যের প্রবাহ, তাতেই বিষয়টা আপনার অনেক সহজে বোঝা হয়ে যাবে। খুব বাজে হলেও যে নোট তুলবেন, সেটা হয়তো আপনি ছাড়া আর কেউ পড়তে পারবে না, কিন্তু সমস্যা নাই, ক্লাসনোট তুলতে গিয়ে আপনি সেটা নিজের অজান্তেই আত্মস্থ করবেন। সেমিস্টার শেষে না হয় বন্ধুর সুন্দর লেখাটাই ফটোকপি করলেন, কিন্তু সেই যে আপনার দুর্বোধ্য ক্লাসনোট— সেটা তোলাটাই আপনার পড়াশোনায় কাজে দেবে অনেক অনেক বেশি।

তাই কষ্ট হলেও ক্লাসনোট তুলে নিন। শোনা আর লেখার এই চক্রের গুরুত্ব সঠিক নিয়মে পড়াশোনায় অনেক বেশি।

কী করে ফাটাফাটি ক্লাস নোট তুলবেন?

এই লেখাটা আসলে আমার লেখা উচিত না; বরং লেখা উচিত আমার কয়েকজন বন্ধুর, যাদের ক্লাসনোট লেখার দক্ষতা দেখে সব সময়ই অবাক হতাম। তবে আমার সেই নোটবাজ বন্ধুদের ক্লাসনোট দেখে অনেক কিছুই শিখেছি, কাজেও লাগিয়েছি। আজকের লেখাটা তার ওপরেই। তবে এটা কেবল ক্লাসনোট বা লেকচার নোটই নয়; বরং সব রকমের নোট তোলার জন্যই প্রযোজ্য।

কারও কথা বা লেকচার শুনে কীভাবে সেটাকে লিখে রাখবেন? কেনই বা রাখবেন? আপনি ছাত্র হন কিংবা গবেষক, চাকরিজীবী, যাই হন না কেন, ক্লাসে, মিটিংয়ে, সেমিনারে নোট তো তুলতেই হয়, তাই না? পড়ার বা কাজের এ এক অপরিহার্য অংশ। কিন্তু নোট কীভাবে তুলছেন তার ওপরে নির্ভর করছে সেটা আপনার কতটা কাজে লাগবে।

১. নোট কি তুলতেই হবে? সব তো মাথায় আছে! : জি হ্যাঁ, লেকচার থেকে কিছু শিখতে হলে আপনাকে ক্লাসে বা সেমিনারে বা মিটিংয়ে নোট তুলতেই হবে। আপনি যতটাই নিজের স্মরণশক্তির ওপরে নির্ভর করেন না কেন, সেটা কখনোই শত ভাগ কার্যকর না। বিশেষ করে কোনো লেকচার যখন শোনেন, তখন লেকচারের বিষয়বস্তু মাথায় ঢুকলেও লেকচার শেষ হতে হতে সেটা আপনার মাথা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে যাবে। এবং পরদিন হয়তো সেই লেকচারের কিছুই আর মনে থাকবে না। তাই লেকচার শুনে বুঝতে বা শিখতে হলে অবশ্যই নোট তোলার অভ্যাস করতে হবে। মাথায় কিছুই থাকে না, আর নতুন জিনিস আসা মাত্র পুরোনো জিনিস গায়েব হয়ে যায়, লেকচার নোট তোলার পেছনে এটাই অনেকটা বড় কারণ।

২. নোট কোথায় তুলবেন : নোট তোলার জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নোটখাতা ব্যবহার করেন। কখনোই খোলা কাগজে নোট লিখবেন না। কম্পিউটারে

টাইপ করে তুলতে পারেন কিন্তু তার চেয়ে কাগজে লিখে নেওয়াটাই অনেক বেশি কাজে দেবে। কারণ নোট তোলার সময়ে অনেক কিছু ছবি আকারে আঁকিবুকি দিয়ে লিখে রাখা যায়, কম্পিউটারে সেটা করাটা অনেক ঝামেলা। তাই বাঁধানো খাতা রাখুন প্রতিটি বিষয়ের জন্য

৩. লেখার পদ্ধতি : নোট তোলার সময়ে অবশ্যই পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে লিখবেন না। বরং প্রতি পাতায় রুল টেনে ডানে বা বাঁয়ে বা নিচের দিকে ৩ ইঞ্চির মতো জায়গা খালি রেখে দিন। নোটের মূল অংশে লিখবেন শিক্ষক বা বক্তা যা বলছেন, তার থেকে নেওয়া আপনার নোট। আর পাশের খালি অংশটা অনেকটা মন্তব্যের ঘরের মতো। নোট তোলার সময়েই আপনার নিজের জন্য কিছু মন্তব্য, কিছু রিমাইন্ডার, এসব সেখানে লিখে রাখতে পারেন। (যেমন— 'এই জিনিসটা ভালো করে বুঝতে হলে অমুক বইটা আজ রাতে আরেকবার পড়তে হবে', 'অমুক তমুক বইয়ের অত নম্বর চিত্র এটা')।

৪. রং : দয়া করে অন্তত দুই রঙের কলম রাখুন। নোটের পাতাকে রংধনুর সাত রঙে রাঙাতে হবে না। কিন্তু অন্তত হেডিং/সেকশন এসব লেখার সময়ে অন্য কালিতে লিখলে পড়তে অনেক সুবিধা হবে।

৫. ঘাড় গুঁজে লেখা বাদ দিন : আমার আরেক বন্ধু নোট তুলত আক্ষরিকভাবে। তার নোট হতো টেপ রেকর্ডিংয়ের মতো, কথায় ধারাভাষ্য থাকত, যেমন— 'এই সময়ে স্যার রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তার পরে তমুক ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন।' এরকম ফালতু কথাবার্তা নোটে লেখার দরকার নাই; বরং শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন, সেটাই লেখেন। সব শব্দ লিখতে হবে এমন কথা নাই, আপনি পারবেনও না। তাই লেকচারের মোদ্দা কথা, কী ওয়ার্ড সেগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করেন। কোনো উদাহরণ দেওয়া হলে, সেটা ভালো করে লেখেন, দরকার হলে ছবি এঁকে রাখুন।

৬. নোট রিভিউ : এটা খুবই দরকারি একটা কাজ, কিন্তু অনেকেই করেন না। নোট লেখার কাজ ক্লাস শেষ হলেই খতম, সেটা যদি ভাবেন, তাহলে ভুল করছেন। প্রতিদিন ক্লাস শেষে বা দিন শেষে নিজের নোটখাতাটা আরেকবার দেখুন। আপনার মাথায় বিষয়টা একেবারে টাটকা থাকতে থাকতেই সেই বিষয়ে আরও কোনো তথ্য পেলে লিখে ফেলেন। নোট খাতার পাশে মার্জিন টেনে খালি জায়গা রাখার কথা বলেছিলাম। সেই

জায়গাটা এখন কাজে লাগান। নোটে যা আছে, তার সাথে অন্য কিছু যোগ করার থাকলে সেখানে যোগ করে দিন। নোটের ব্যাপারটাকে দরকার হলে নিজের ভাষায় এবং নিজে যা বুঝেছেন, সেভাবে মন্তব্য আকারে লিখে রাখেন এই জায়গায়।

ব্যস, এই সহজ পরামর্শগুলা মেনে চললেই আপনি তুলতে পারবেন অসাধারণ সব ক্লাস কিংবা মিটিং নোট।

পুনশ্চ— হাতের লেখা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি নিজে বুঝলেই হলো। ক্লাস শেষে বা দিন শেষে রিভিউ করার সময়ে অস্পষ্ট লেখাকে স্পষ্ট করে নিলেই হলো।

বিদ্যাকৌশল

পড়ার ও শেখার নানা কার্যকর কায়দা

শেখার নানা কায়দা

শিখতে চান কিছু একটা খুব দ্রুত?

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও, সময় দিয়েও শিখতে পারছেন না?

অথচ আপনার এক বন্ধু মাত্র আধা ঘণ্টা পড়েই ব্যাপারটা বুঝে গেছে?

কীভাবে?

আমরা সবাই কিন্তু একইভাবে শিখতে পারি না। একেক জনের শেখার পদ্ধতি একেক রকম। এবং কোনো কিছু শেখার একাধিক পদ্ধতি আছে, একেক জনের ক্ষেত্রে একেকটা কাজ করে। তাই আসুন, দেখে নিই কিছু পদ্ধতি। আপনার কাজ হবে এ অধ্যায়টি পড়ার পরে নিজের পড়ার সময়ে এগুলো একে একে প্রয়োগ করে দেখা, কোনটা আপনার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে।

শেখার নানা কায়দার পূর্ণাঙ্গ তালিকা করতে গেলে অনেক জায়গা লেগে যাবে, আমরা তাই এখানে আলোচনা করব কেবল শিক্ষাবিদ নীল ফ্লেমিংয়ের VARK মডেলটা। এই মডেল অনুসারে আমরা শিখতে পারি চার ভাবে—

১. **V = ভিজ্যুয়াল লার্নিং :** অর্থাৎ দেখে দেখে শেখা।

২. **A =অডিটরি লার্নিং :** অর্থাৎ শুনে শেখা।

৩. **R =রিড/রাইট লার্নিং :** অর্থাৎ পড়ে ও তারপর সেটা নিজে লিখে শেখা।

৪. **K =কাইনিস্থেটিক লার্নিং :** অর্থাৎ হাতেকলমে করে করে শেখা।

ভিজ্যুয়াল লারনার বা দেখে দেখে শিখতে যারা অভ্যস্ত, তারা যেকোনো কিছু ছবি বা ভিডিও আকারে দেখলে ভালো শিখতে পারেন। যেমন ধরা

যাক, পৃথিবীর বহু দেশের রাজধানীর নাম মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে দেশগুলোর নাম আর রাজধানীর নাম চিত্রে লিখে এদের মধ্যে একটি রেখা টেনে গ্রাফ আকারে দেখে এরা শিখতে পারবেন। আবার ধরা যাক, বাংলা ব্যাকরণের সমাস কত প্রকার ও কী কী— এটা শিখতে হচ্ছে। বইয়ের পাতায় সমাসগুলোর নাম তালিকা আকারে পড়ার বদলে ছবি আকারে এঁকে দিলে ভিজ্যুয়াল লারনারেরা সহজে শিখবেন।

আপনি কি বিশাল রচনা পড়ার চেয়ে ছবি দেখে ভালো করে শিখতে পারেন? তাহলে আপনি ভিজ্যুয়াল লারনার হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে যেকোনো কিছু পড়ার সময়ে আপনার কাজ হবে চিত্র দেখে পড়া, আর পড়ার সময়ে নিজে একটা ছবি এঁকে নিজের কনসেপ্ট পরিষ্কার করা। যেমন ধরেন— রসায়নে ইউরিয়া সারের প্রস্তুতপ্রণালি শিখতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে প্রস্তুতপ্রণালি পড়ার পরে নিজেই এটার একটা ছবি এঁকে ফেলেন। আপনি ভিজ্যুয়াল লারনার হলে এই ছবিটার মাধ্যমেই আসলে আপনার ভালো মনে থাকবে। পরীক্ষায় লেখার সময়ে ছবিটার কথা স্মৃতি থেকে বের করে সেটা ভাষায় লিখে ফেললেই হলো। ভিজ্যুয়াল লারনারদের জন্য কিছু পরামর্শ হলো— শ্রেণিকক্ষে সামনের দিকে বসেন যাতে শিক্ষককে এবং বোর্ডে কী লেখা হচ্ছে, তা ভালো করে দেখতে পারেন। ক্লাসে পড়ার সময় নোটের মধ্যে দরকারমতো ছবি এঁকে রাখুন।

অডিটরি লারনার বা যারা শুনে শুনে শিখতে অভ্যস্ত, তারা কোনো কিছু ছবি দেখে বোঝার বদলে কেউ সেটা ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো করে বুঝতে পারেন। আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে, ক্লাসে লেকচার শুনেই ভালো বোঝেন, বই পড়ে সেরকম ভালো বোঝেন না, অথবা লিখে কিছু ব্যাখ্যা করার চেয়ে মুখে বলাই সহজে ও ভালোভাবে পারেন, তাহলে সম্ভবত আপনি অডিটরি লারনারের পর্যায়ে পড়েন।

অডিটরি লারনার বা শ্রুতি শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি সবচেয়ে ভালো শিখবেন কানে শুনে। তাই ক্লাস লেকচার ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করেন। আরও ভালো হয় যদি লেকচার নোটের বদলে লেকচারটা অডিও রেকর্ড করে রাখেন। পড়ার সময়ে কোনো কিছু আপনার বন্ধুকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বলেন, বই পড়ার চেয়ে বন্ধুর এই মুখে ব্যাখ্যা করাটাই কাজে লাগবে।

আর একা একা পড়ার সময়ে জোরে জোরে পড়েন। নিজের পড়া নিজের মুখ থেকেই কানে গিয়ে আপনার মগজে পৌঁছাবে ভালো।

রিড/রাইট লারনারেরা আবার একটু অন্য রকম, কোনো কিছু পড়ার পরে সেটা লিখে ফেললে তবেই মাথায় ঢোকে। আপনি যদি এই গোত্রে পড়েন, তাহলে প্রতিদিন এভাবে লেখার অভ্যাস করেন। আজকে কী শিখলেন, এটা লিখতে গিয়েই আপনার মনে ঢুকবে ভালো করে। দরকার হলে যেকোনো পাঠ্যবিষয় একবার পড়ে তার পরে নিজের ভাষায় লিখে দেখুন।

সবশেষে কাইনেস্থেটিক লারনার বা হাতেকলমে যারা শিখতে পারেন, তারা আসলে বই পড়ে বা কারও কথায় শুনে আদৌ শিখতে পারেন না। তাদের শিখতে হয় নিজে করে ঠেকে শিখে। সব রকমের শিক্ষার জন্য এটা কাজে আসে না, তবে অনেক ক্ষেত্রে যদি কোনো কিছুর গড়ন বা এরকম কিছু শেখার দরকার হয়, তাহলে একটা মডেল বা নমুনা কাগজ দিয়ে বা পুটিং দিয়ে বানিয়ে নিয়ে হাতেকলমে অনেক ভালো শিখতে পারেন এরকমের শিক্ষার্থীরা।

শেখার হাজারো রকমফের আছে। প্রাথমিক চারটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হলো। আপনার কাজ হবে এখন খুঁজে বের করা, কোন উপায়ে শিখলে আপনি সবচেয়ে ভালো শিখতে পারেন। সেটা করার পরের কাজ তো সোজা, তাই না? যেভাবে ভালো শিখেন, সেভাবেই পড়াশোনার কাজটা গুছিয়ে নিন। শেখাটাই আসল, কীভাবে শিখলেন সেটা না, তাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিটাই বেছে নিন।

গ্রুপ স্টাডি

একসাথে দলবেঁধে পড়া, তারই নাম হলো গ্রুপ স্টাডি। পড়াশোনা করার বেশ ভালো একটা কায়দা এটা। তো কেন এটার দরকার আছে এবং কী করে গ্রুপ স্টাডির সুবিধাটা পাবেন ভালো করে, দেখা যাক।

কেন গ্রুপ স্টাডি করবেন?

গ্রুপ স্টাডি করার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমেই আসে সংখ্যার সুবিধা। একজনের মাথার চেয়ে পাঁচজনের মাথার ক্ষমতা বেশি, কাজেই পড়াশোনা করার সময়ে একাধিক জন একসাথে পড়তে বসলে অনেক দ্রুত পড়ে ফেলা যায় বড় সিলেবাস। এর সাথে আছে সিলেবাস ভাগ করে নেওয়ার সুবিধাটা— একেক জন একেক অংশ নিজে পড়ে যদি অন্যদের নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন, তাহলে পড়াটা হয় অনেক সহজ। এর পরেই আসছে একেক জনের দক্ষতার প্রশ্ন— সবাই তো সবকিছু সমান বোঝে না, কেউ কেউ সিলেবাসের কোনো অংশ ভালো বোঝে, আবার অন্য কেউ হয়তো অন্য অংশটা এনেছে নখদর্পণে। সবাই মিলে পড়লে তাই যে যা ভালো বোঝে তা পড়ে অন্যদের বোঝাতে পারবে।

গ্রুপ স্টাডির মোদ্দা কথা সেটাই— দশে মিলি করি কাজ। সবাই মিলে সহযোগিতার মাধ্যমে পড়াশোনা করা।

গ্রুপ স্টাডির কায়দা

- **প্রস্তুতি পর্ব :** লাইব্রেরি বা অন্য কোথাও সবাই একসাথে বসে পড়তে হবে। পড়ার জন্য যা যা দরকার সব সাথে নিয়ে।

- **পরিকল্পনা পর্ব :** প্রথমেই আলোচনা করে ঠিক করে নিতে হবে কতক্ষণ পড়বেন, কী পড়বেন।

- **দায়িত্ব ভাগ পর্ব :** এর পর কাজ ভাগ করে নেওয়ার পালা— কে কোন অংশটুকু পড়বে, তা ঠিক করে ভাগ করে দিতে হবে দায়িত্ব।

- **পড়ার পর্ব :** এবার পড়া পড়া পড়া। আর নির্দিষ্ট সময় পড়ার পরে প্রত্যেকে নিজের অংশটুকু সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন, দরকার হলে পড়ার সময়ে দরকারি অংশটুকু নোট করে রাখবেন।

- **আলোচনা পর্ব :** পড়ার কাজ শেষ, এবারে করতে হবে সমন্বয়। যে যা দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তার কতটুকু হয়েছে আর কতটুকু হয়নি, তার হিসাব।

- **পড়া বোঝানো পর্ব :** এবার যে যা বুঝেছেন পড়ে, তা অন্যদের পালা করে করে বোঝানো।

- **পর্যালোচনা :** সব শেষের কাজ হলো আজকের গ্রুপ স্টাডি সেশনের মূল্যায়ন করা, মানে পরিকল্পনায় থাকা অংশটুকুর কতটা আজকে শেষ করা গেছে, তার হিসাব-নিকাশ, তার পাশাপাশি আগামী কবে আবার গ্রুপ স্টাডি করবেন, তার আগে পর্যন্ত কার বাড়ির কাজ কী হবে, তার একটা পরিকল্পনা।

গ্রুপ স্টাডি সফল করতে হলে কী করবেন?

গ্রুপের আকার— অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, প্রবাদ আছে তাই না? ঠিক সেরকমই অতিরিক্ত লোকজন পড়তে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না; বরং সময় নষ্ট হবে। তাই গ্রুপের সাইজ ছোট রাখুন। তিন-চারজনের বেশি বড় গ্রুপ করলে কাজের চেয়ে অকাজই বেশি হবে।

গ্রুপের একজনকে মডারেটর বা সমন্বয়কের দায়িত্ব নিতে হবে। তার কাজ হবে গ্রুপের সবকিছু ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা খেয়াল রাখা।

গ্রুপ স্টাডিতে যা আলোচনা করবেন, তা সবাই যেন আগে থেকে পড়ে আসেন। সবচেয়ে ভালো হয় কে কোন অংশটা বুঝতে পারছেন না, তার একটা তালিকা করে আনলে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত তালিকাটা এক করলে বোঝা যাবে কোন অংশটার ওপরে জোর দিতে হবে।

আড্ডা কমানো : আড্ডা অবশ্যই ভালো। কিন্তু আড্ডার সময় আলাদা করে রাখতে হবে। পড়ার সময়ে পড়া, আর কিছু না, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সমন্বয়কের কাজটা এখানে তাই গুরুত্বপূর্ণ।

খাওয়াদাওয়া : খালি পেটে গ্রুপ স্টাডি করতে বসবেন না। আগে পেট হালকা করে ভরিয়ে তার পরে পড়তে বসবেন। বেশি ভরালে আবার ভাতঘুম পেয়ে বসবে। পড়ার জায়গায় খাবার রাখবেন না। কারণ পড়ার সময়ে খাওয়া কিংবা ধূমপান অন্যদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

না বুঝেই মাথা নাড়ানো : গ্রুপ স্টাডিতে দলবেঁধে কাজ করলেও খেয়াল রাখবেন, আপনি কিন্তু নিজে পড়া বোঝার স্বার্থেই এটা করছেন। জনস্বার্থে না। কাজেই পড়া আসলেই নিজে বুঝছেন কি না, তা খেয়াল রাখেন। যদি কোনো কিছু না বোঝেন, তাহলে লজ্জা না করে মুখ ফুটে সেটা বলেন। অন্যরা বুঝছেন, তাই আপনিও যদি বোঝার ভান করেন, তাহলে কিন্তু আপনি নিজেই ঠকবেন। কাজেই মানসম্মান বাসায় রেখে এসে গ্রুপ স্টাডি করতে বসবেন।

গ্রুপ গঠনে সতর্কতা

গ্রুপ স্টাডির গ্রুপ বানাবার সময়ে ভেবেচিন্তে বানান। কারণ ফাঁকিবাজ কেউ অন্যদের ঘাড় ভেঙে কাজ করিয়ে নিতে থাকলে সেটা সামগ্রিকভাবে গ্রুপের জন্য ক্ষতিকর হবে। সে জন্য ভালো হয় যদি আপনার সাথে সমমনা কারও সাথে গ্রুপ স্টাডি করেন।

গ্রুপ স্টাডি কি সবার জন্য?

গ্রুপ স্টাডি অবশ্য সবার জন্য ভালোভাবে কাজে আসবে, তা নয়। কেউ কেউ আছেন যারা নিজে নিজে পড়তেই ভালোবাসেন, অন্যদের সাথে মিলে পড়তে গেলে তাদের পড়া হয় না আদৌ। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দলের। তাই গ্রুপ স্টাডিকে ধন্বন্তরি সমাধান মনে না করে; বরং যাচাই করে দেখুন আপনার নিজের লাভ কতটা হচ্ছে। তার পরই ঠিক করুন গ্রুপ স্টাডি করবেন কি না।

নানারকমের বিষয় পড়ার মোক্ষম উপায়

পড়ার নানারকমের কায়দা আছে। ঘুরেফিরে এ বইয়ে এর অনেকগুলোই আলোচনা করা হবে। কিন্তু কোনো বিষয় পড়ার জন্য বেশ কিছুটা সময় যদি থাকে, তাহলে কীভাবে পড়বেন? এ ক্ষেত্রে নিচের দুইটা পদ্ধতিতে পড়তে পারেন— ধরা যাক আপনার পরীক্ষার আগে এক মাস সময় আছে।

১. টোটাল ইমারশন টেকনিক : একটা বিষয় নিয়েই কেবল পড়বেন, সেটা আপনার ধ্যানজ্ঞান হবে। এক মাস সময় থাকলে সেটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিন। প্রতি অংশে কেবল এক বিষয় নিয়েই পড়বেন এবং আর কিছুই পড়বেন না। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এই কয়দিন পড়ার পরে এই পুরো জিনিসটা আপনার মাথায় খুব ভালো করে ঢুকবে। সমস্যা হলো, আপনি পরের বিষয়টা এভাবে পড়তে যখন যাবেন, তখন আগের বিষয়টা মাথা থেকে গায়েব হয়ে যেতে পারে।

২. ডিস্ট্রিবিউটেড পড়া : সবগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়বেন। মানে দিনে আট ঘণ্টা পড়াশোনা করলে চারটি বিষয়ের প্রতিটি দুই ঘণ্টা করে পড়তে পারেন। এতে করে প্রতিদিনই প্রতিটি বিষয় ঝালাই করে নেওয়া চলবে। অসুবিধাটা হলো যেকোনো বিষয়ের একেবারে গভীরে যেতে হলে এত অল্প সময়ে হয়তো হবে না।

তাহলে উপায়? মোক্ষম উপায় হলো ওপরের দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে পড়া। মানে পরীক্ষার কয়েক মাস সময় বাকি থাকলে প্রথম অংশে মানে মূল পড়ার সময়ে টোটাল ইমারশন টেকনিকে পড়বেন। আর শেষের দিক ঘনিয়ে এলে ঘুরেফিরে প্রতিদিন ঝালাই দিতে থাকবেন প্রথম পরীক্ষার সপ্তাহ খানেক আগে পর্যন্ত। তারপর প্রথম পরীক্ষার জন্য আবারও টোটাল ইমারশন টেকনিক।

ভর্তি পরীক্ষার পড়া

ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপার একটু আলাদা। ভর্তি পরীক্ষায় কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে না পড়ে পড়তে হবে পুরো সিলেবাসের ওপরেই। সে জন্য এ ক্ষেত্রে আসলে পড়া এবং প্রস্তুতি দুইটাই আলাদা হতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য তিন মাস সময় আছে এমন যদি হয়, তাহলে প্রথম মাসের শুরুর দুই সপ্তাহ পুরোনো প্রশ্নপত্র দেখে দেখে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ফরম্যাট সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে। এর পর পুরো সিলেবাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করে পড়তে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে সেই অংশের ওপরে অন্তত তিন-চারটি মক টেস্ট (আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার) দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার মাস খানেক আগের মধ্যে সিলেবাস শেষ করে ফেলা দরকার, কারণ এর পরের বাকি সময়টাতে অন্তত প্রতিদিন এক ঘণ্টার মক টেস্ট, কয়েক ঘণ্টা ধরে রিভিশন করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি তিন-চার দিন পর পর পূর্ণদৈর্ঘ্যের একটি পরীক্ষা দিয়ে নেওয়া ভালো, যাতে সময়ের আন্দাজটা ভালো হয়।

এমসিকিউ পরীক্ষার পড়া

এমসিকিউ পরীক্ষা বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় ব্যাপার হলো দ্রুত প্রশ্ন পড়তে পারা। সাধারণত প্রতি প্রশ্নের জন্য এক মিনিটের মতো সময় বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যে প্রশ্ন পড়ে উত্তর বেছে নিতে হবে। তাই সিলেবাস ভালো করে পড়ার পাশাপাশি যেটা করতে হবে তা হলো, প্রশ্ন দ্রুত পড়ার অভ্যাস করা। এ বইতেই দ্রুত পঠনের ওপরে একটি পরামর্শ অধ্যায় আছে। সেখানে দেওয়া পরামর্শগুলো অনুসরণ করে পড়ার গতি বাড়িয়ে নিন। আপনার লক্ষ্য হবে যাতে গড়ে ২০-৩০ সেকেন্ডের মধ্যে প্রশ্ন এবং অপশনগুলো পড়া শেষ করতে পারেন এবং উত্তর বেছে নেওয়ার জন্য ৩০ সেকেন্ড সময় হাতে থাকে। এ জন্য পুরোনো প্রশ্ন নিয়ে ঘড়ি ধরে অনুশীলন করুন। শুরুতে প্রশ্ন পড়তে সময় লাগলেও দীর্ঘদিন অনুশীলন করলে এ সময়টা কমিয়ে আনতে পারবেন।

কনসেপ্ট পরিষ্কার করার জন্য পড়া

ওপরের আলোচনাগুলো মূলত পরীক্ষার জন্য, কিন্তু ধরা যাক পরীক্ষা নয়, আপনার কনসেপ্ট বা ধারণা পরিষ্কার করার জন্য পড়ছেন। আসলে সব পড়ার উদ্দেশ্যই সেটা হওয়া উচিত, কনসেপ্ট পরিষ্কার হলে যেকোনো পরীক্ষাই সহজে দেওয়া যায়। কিন্তু কনসেপ্ট বা ধারণা পরিষ্কার করতে হলে কীভাবে পড়বেন?

আপনার কনসেপ্ট পরিষ্কার কি না, সেটা আগে বুঝতে শিখুন। এটা বোঝার সহজ উপায় হলো পড়ার পরে অন্য কাউকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছেন কি না। তাই এ কাজটা করতে হবে অন্তত দুজন মিলে। যে অধ্যায়টা পড়বেন, সেটা দুজনেই পড়েন একই সাথে, পড়ার প্রথম ভাগে। পরের অংশে আপনাদের কাজ হলো একজন আরেকজনকে বোঝাবেন। বোঝানোর কাজটা মুখে মুখে করতে পারেন। অথবা লিখেও করতে পারেন। লেখার ক্ষেত্রে বই থেকে হুবহু মুখস্থ না লিখে বরং লেখার চেষ্টা করুন নিজের ভাষায়। এবার যাচাই করে দেখুন, আসলেই ঠিকমতো বোঝাতে পারছেন কি না— একে অন্যকে।

ধারণা নিখাদ করার জন্য আপনাকে প্রতিটি বিষয় ভালো করে পড়তে হবে, পড়ার পর মনে মনে চিন্তা করতে হবে, দরকার হলে ছবি এঁকে নিজেই নিজের চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলেন। পড়ার বিষয়টি পড়তে পড়তেই সেটা নিয়ে কত রকমের প্রশ্ন হতে পারে, তা ভেবে দেখুন ও লিখে রাখুন। ধরা যাক, আপনি পড়ছেন অক্সিজেন মৌলটি নিয়ে। যত রকমের প্রশ্ন সম্ভব, তা লিখে ফেলুন। দরকার হলে দুই বন্ধু মিলে প্রশ্ন বানান ও একে অন্যের সাথে শেয়ার করুন। আরও ভালো করে মাথা খেলাতে হলে বাংলায় পড়ে ইংরেজিতে লিখে ব্যাখ্যা করে দেখুন বা উল্টাটা। এবং কেবল বইয়ের ওপরে নির্ভর করে না থেকে উইকিপিডিয়াসহ ইন্টারনেটের নানা জায়গায় এ বিষয়টির ওপরে কী লেখা আছে, তা চট করে দেখে নিন। ইন্টারনেটে ইউটিউব কিংবা শিক্ষক ডটকমের মতো শিক্ষাবিষয়ক সাইটে কী আছে, তা-ও দেখে নিতে পারেন। এভাবে যতভাবে পারা যায়, চর্বিত চর্বণ করে তবেই পুরো বিষয়টির নাড়িনক্ষত্র আসবে আপনার নখদর্পণে।

ভাইভা পরীক্ষার পড়া

মৌখিক পরীক্ষা তথা ভাইভার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। ভাইভা পরীক্ষায় জ্ঞানের পাশাপাশি জ্ঞানটুকু কীভাবে উপস্থাপন করছেন, আপনার আত্মবিশ্বাস— এর সবটাই যাচাই করা হয়। কাজেই ভাইভার জন্য প্রস্তুতি নিতে হলে ভালো করে জানার পাশাপাশি তা উপস্থাপনও অনুশীলন করতে হবে, দরকার হলে বাসার কাউকে প্রশ্নকর্তা সাজিয়ে রীতিমতো ঘটা করে ভাইভা দিয়ে অনুশীলন করুন। বইটির মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্রুতপঠন
কী করে দ্রুত পড়বেন

পড়াশোনা করার সময়ে সিলেবাসের নানা অধ্যায়ের আকার দেখে অনেকেই ভিরমি খাবার দশায় পড়েন, কী করে এত বড় সিলেবাস শেষ করবেন, সেটা ভেবেই কূল পান না। এর একটা বড় কারণ হলো পড়ার গতি।

আপনি যখন পড়েন, তখন কী গতিতে পড়েন— তা কখনো ভেবে দেখেছেন? এই যে একটা পাতা পড়ছেন, পড়তে কতটা সময় লাগছে আপনার? একটু হিসাব করেই দেখুন না।

একেক জনের পড়ার গতি একেক রকম। আর যত দ্রুত পড়তে পারবেন, তত দ্রুত কোনো অধ্যায় পড়ে শেষ করতে পারবেন। তাই পড়ার গতিটাকে বাড়াতে পারলে আপনার পড়াশোনার গতিটাও বাড়বে।

কিন্তু পড়ার গতি বেশি কম হয় কেন? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, অধিকাংশ মানুষ কোনোকিছু পড়ার সময়ে অনেকটা হেঁচকি তুলে তুলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ে থাকে। মানে এক শব্দ থেকে পরের শব্দে গিয়ে আবার আগের শব্দে চোখ বুলায় নিজের অজান্তেই, অনেকটা সেই বানর আর তৈলাক্ত বাঁশের মতো। এর ফলে পড়ার গতিটা অনেক কমে যায়। দ্রুত পড়তে হলে আপনাকে আসলে এই হোঁচট খাওয়াটা বাদ দিতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হলো পড়ার সময়ে নিজের অজান্তেই আপনার ঠোঁট জিভ ও কণ্ঠনালি নড়তে থাকা, অনেকটা বিড় বিড় করে শব্দ করে পড়ার মতো। খেয়াল করে দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে কিছু পড়ার সময়ে শব্দ করে না পড়ার জন্য নির্ঘাত বকা খেয়েছিলেন, তাই না? এই শব্দ করে পড়ার ওপরে জোর প্রয়োগের ব্যাপারটা অনেকের মনের মধ্যে ঢুকে যায়, ফলে সারা জীবন যেকোনো কিছু পড়ার সময়ে অবচেতনভাবেই ঠোঁট জিভ নড়তে থাকে। আর তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো পড়ার গতি অনেক অনেক কমে আসা।

তাহলে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন?

খুব সহজ। আমি নিজে যে পদ্ধতিতে দ্রুতপঠন আয়ত্ত করেছিলাম, সেটার কথাই বলি— আমি পড়ার সময়ে একটি একটি শব্দ ধরে না পড়ে অনেকটা স্ক্যান করার মতো করে পড়ে যেতাম। কোনো কিছু পড়ার সময়ে আসলে সবগুলো শব্দ পড়তে হবে, তার কোনো দরকারই নাই। ইংরেজির কথা বলি— যেকোনো ইংরেজি বাক্যের the, a, an, of, in, on— এই টাইপের শব্দগুলো বাদ দিলেও কিন্তু বাক্যের অর্থ বোঝা যায়। আপনার যদি সংজ্ঞা মুখস্থ করার ব্যাপার থাকে তাহলে অন্য কথা, কিন্তু সেরকম পাখি পড়ার বাধ্যবাধকতা না থাকলে এসব শব্দ বাদ দিয়েও আপনি পড়ে যেতে পারেন, শব্দের অর্থ বোঝেন বা না বোঝেন, চোখটাকে বাম থেকে ডানে বুলিয়ে নিন, একবারও না থেমে। তাহলেই দেখবেন হুবহু বাক্যটি মুখস্থ বলতে না পারলেও আসলে বাক্যটির মোদ্দা কথা মাথায় ঢুকবে।

ধাপগুলো তাহলে দেখা যাক—

১. বাক্য পড়ার সময়ে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিয়ে পড়েন।

২. শব্দ করে পড়বেন না। দরকার হলে গলায় আঙুল দিয়ে দেখেন কণ্ঠনালির পেশিগুলো নড়াচড়া করে কি না মনের অজান্তেই।

৩. দ্রুতপঠনের জন্য চোখের অনুশীলন করুন, চোখকে পাতার বাম প্রান্তে বাক্যের শুরু বরাবর রেখে বাক্য ধরে মসৃণ গতিতে হোঁচট না খেয়ে ডান পর্যন্ত আনেন, আবার বামে চলে গিয়ে পরের লাইনে যান এভাবে চোখ নাড়াতে অভ্যাস করেন।

৪. এবার যেকোনো বই বেছে নেন। কোনো প্যারাগ্রাফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবে পড়েন, সব শব্দ পড়তে হবে এমন দরকার নাই কথাটা মাথায় রেখে। পড়ার পরে নিজের মনে মনে চিন্তা করে দেখেন প্যারাগ্রাফে আসলে কী বলা হয়েছে, সেটা আপনার মাথায় কেমন ঢুকেছে। তার পর আপনার দ্রুতপঠনের মাধ্যমে বোঝার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য প্যারাগ্রাফটিকে স্বাভাবিক গতিতে পড়ে দেখুন। এবার মিলিয়ে দেখুন, দ্রুতপঠনে আপনি প্যারাগ্রাফটা কেমন বুঝেছিলেন।

এভাবে প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট করে অভ্যাস করুন। দ্রুত পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে একসময় আপনি একটি একটি শব্দ ধরে না পড়ে পুরো লাইনটি একবারে পড়ে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার পড়াটা বাম থেকে ডানে ঘুরে ঘুরে না হয়ে আসলে হবে ওপর থেকে নিচে, আর এর মাধ্যমে যেকোনো লেখা আপনি খুব দ্রুত পড়তে পারবেন।

দ্রুতলিখন
কী করে লিখবেন দ্রুত

আর পাঁচটা মিনিট সময় পেলেই শেষ করতে পারতাম...

ইশ্, সবই জানি, কিন্তু লেখার সময় পাই নাই!

এ কথাগুলো কি চেনা চেনা লাগে? পরীক্ষার হলে সময়াভাবে জানা প্রশ্নও ছেড়ে আসেন নাই— এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এর কারণ কী? কারণ হলো হাতের লেখার ধীরগতি। দ্রুত লিখতে না পারলে নির্ধারিত সময়ে লেখা শেষ করতে পারা যাবে না, আর জানা প্রশ্ন ছেড়ে এসে ছিঁড়তে হবে চুল। আসুন, দেখা যাক, কী করে দ্রুত লিখতে পারবেন।

কলম ঠিকমতো নিয়েছেন কি?: কী কলমে লিখছেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই আপনার লেখার গতিকে প্রভাবিত করে। কেউ কেউ খসখসে কলমে লিখতে পারেন ভালো। আবার কারও দরকার মসৃণ কলম। আপনি কোনটাতে ভালো করে লিখতে পারেন তা বের করে নিন। এ জন্য কয়েক রকমের কলম জোগাড় করে একই লেখা ঘড়ি ধরে লিখে দেখুন। যেটাতে দ্রুত লিখতে পারছেন, সেরকমের কলমই পরীক্ষায় ব্যবহার করবেন। বল পয়েন্ট পেন কেনার পর পর বেশ খসখসে থাকে। কিছুটা ব্যবহার করার পরে মসৃণ হয়। আমি নিজে খসখসে কলমে দ্রুত লিখতে পারতাম, তাই পরীক্ষার জন্য এক বাক্স নতুন বলপেন নিয়ে যেতাম। তবে আমার স্ত্রী, যে নিজেও খুব ভালো ছাত্রী ছিল, খসখসে কলমে একেবারেই লিখতে পারত না, তাই সে এক বাক্স পুরোনো বলপেন নিয়ে যেত পরীক্ষা দিতে। আপনার কোনটাতে সুবিধা, তা বুঝে সেটাই ব্যবহার করুন।

খাতা কীভাবে ধরেছেন, খেয়াল করুন: আমরা যখন বসে বসে লিখি, তখন আমাদের হাতটা কনুই বরাবর ঘুরছে। আর শব্দ লেখার সময়ে

হাতের আঙুল আর কলম ওঠানামা করছে। নানাভাবে খাতা ঘুরিয়ে দেখুন কোনভাবে লিখলে দ্রুত লিখতে পারেন।

লেখার আকার ছোট করুন: অনেকেই রসগোল্লা সাইজের মতো বড় বড় করে লেখেন। নানা বিষয়ে প্রতি প্রশ্নের উত্তর বড় করে করে লিখলে প্রতি প্রশ্নে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লেখা যায় বটে, কিন্তু সময় লাগবে অনেক। আপনার লক্ষ্য যদি হয় দ্রুত লেখা, তাহলে আপনার লেখার আকার ছোট করে দিন। প্রতিটি অক্ষর যদি বড়র বদলে ছোট আকারে লেখেন, তাহলে আপনার মোট সময় বেশ কম লাগবে।

কলম ঠিকভাবে ধরুন: লেখার গতি কমে যাওয়ার আরেকটা কারণ হলো হাতের ওপরে স্ট্রেস বা চাপ পড়া। লেখার সময়ে কলমকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে লিখছেন নাকি? যদি কলমের ওপরে অপ্রয়োজনীয় রকমের জোরে চাপ দিয়ে ধরেন, তাহলে কিন্তু আপনার হাতের আঙুলের ও হাতের তালুর পেশিতে অনেক বেশি চাপ পড়ছে। এভাবে কিছুক্ষণ লেখার পরে হাত ব্যথা হতে বাধ্য। তাই কলম এভাবে জোরে না ধরার দিকে খেয়াল রাখুন।

কীভাবে অক্ষর লেখেন তা খেয়াল করুন: প্রতিটা অক্ষর অনেকভাবে লেখা যায়। আপনি কি সবচেয়ে দক্ষ বা এফিশিয়েন্টভাবে তা লিখছেন? এক কাজ করুন, খাতাকলম নিয়ে এক এক করে প্রতিটি অক্ষর লিখুন, বাংলা ইংরেজি দুভাবেই। একই অক্ষরকে অনেকভাবে লেখা যায়। সবচেয়ে কম হাত নেড়ে কীভাবে এক টানে লেখা যায়, সেটা ভেবে দেখুন। একটা উদাহরণ দিই, ইংরেজি P অক্ষরটাকে দুভাবে লেখা যায়। একটা উপায় হলো ওপরে বামের কোনা থেকে শুরু করে প্রথমে খাড়া দাগটা ওপর থেকে নিচে দিয়ে, এবং তার পরে অর্ধচন্দ্রাকার অংশটা লিখে। অন্য উপায় হলো নিচে বামের কোনা মানে খাড়া দাগটার তলার মাথা থেকে শুরু করে নিচ থেকে ওপরে গিয়ে এবং এরপর কলম না উঠিয়েই অর্ধ চন্দ্রাকার অংশটা লিখে ফেলেন। খেয়াল করলে দেখবেন, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কম সময় লাগে একটু। একবারে হয়তো খুব অল্প, আধা সেকেন্ড বাঁচবে। কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল যোগ করে যেমন মহাসাগর হয়, সেরকম সব অক্ষর থেকে অল্প অল্প করে সময় বাঁচিয়ে ফেলতে পারলে একই লেখা আপনি অনেকটাই কম সময়ে লিখতে পারবেন। এভাবে দক্ষতার সাথে লেখাটা চর্চার ব্যাপার, আপনার কোন অক্ষরে বেশি সময় যাচ্ছে, সেটা একটু সময় দিয়ে হলেও

বের করে ফেলেন, একবার সেটা ধরতে পারলে আপনার লেখার গতি অনেকখানিই বাড়বে।

দ্রুত নোট লেখা: ওপরের কথাগুলো পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য বিশেষ করে প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক সময়ে আপনার লক্ষ্য হলো দ্রুত ক্লাসনোট তোলা যা আপনার নিজের জন্য। সেটা কীভাবে করবেন? আসুন, দেখা যাক—

সংক্ষেপে লিখুন— ক্লাসনোট বা আপনার নিজের জন্য নোট লেখার সময়ে সম্পূর্ণ বাক্য লেখার দরকার নাই, অদরকারি শব্দ যেমন ইংরেজিতে (preposition, article, verb) এসব বাদ দিয়ে লিখতে পারেন।

সংকেত ব্যবহার করুন— and এর বদলে & লিখুন। অথবা with-এর বদলে ' চিহ্নটি দিন। বাংলায় লেখার সময়ে এরকম কিছু সংকেত বানিয়ে নিন। আপনার নিজের বোঝার মতো এরকম কিছু শর্টকাট সাংকেতিক জিনিস ব্যবহার করুন।

ভয়েস রেকর্ডারের সাহায্য নিন— অনেক সময়ে ক্লাসে দ্রুত সবকিছু লেখার সময় পাবেন না, অনেক কিছু হয়তো বাদ পড়ে যাবে। এ জন্য ফোনটাকে ভয়েস রেকর্ডার হিসেবে ব্যবহার করুন। ক্লাস শেষে যেসব জায়গা বাদ পড়ে গেছে, তা এই রেকর্ডারের থেকে শুনে লিখে ফেলুন।

দ্রুত পড়ে বোঝা ও শেখার উপায়
তিনটি কার্যকর পদ্ধতি

খুব দ্রুত অনেক পড়া পড়ে বুঝতে, শিখতে ও মনে রাখতে চান? আসুন, চট করে একটা ধন্বন্তরি কায়দা শিখিয়ে দিই।

এর নাম হলো SQ3R পদ্ধতি।

ফ্রান্সিস প্লিজ্যান্ট রবিনসন তার ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত বই এফেক্টিভ স্টাডিতে এই পদ্ধতির কথা প্রথমে বলেন। এ পদ্ধতিতে কোনোকিছু দ্রুত পড়া বোঝা ও শেখার কাজটা পাঁচটি ধাপে করতে হবে, ধাপগুলোর আদ্যাক্ষর নিয়েই এর নাম হয়েছে SQ3R।

প্রথম ধাপ : Survey (চোখ বোলানো) এই ধাপে যে অধ্যায় বা বিষয়টি পড়ছেন, তার ওপরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিন। একেবারেই চোখ বোলানো কিন্তু, মোটেও বিস্তারিত পড়তে যাবেন না। এই ধাপের উদ্দেশ্য কিন্তু পড়া নয়; বরং আপনাকে যা পড়তে হবে, তার অবস্থা যেমন কয় পাতা, কী কী অনুচ্ছেদ, পয়েন্ট আছে, কী কী চিত্র আছে, সংজ্ঞা আছে ইত্যাদি দেখে নেওয়া। এটা করতে খুব একটা সময়ও লাগবে না, চোখ বোলানোই তো, তাই না? তাই অল্প কয়েক মিনিটেই পুরো চ্যাপ্টারটা বা পাঠ্য বিষয়টির ওপরে একনজর দেখে নিতে পারবেন।

দ্বিতীয় ধাপ : Question (প্রশ্ন করা) এই ধাপে আপনার কাজ হবে কিছু প্রশ্ন বানানো। প্রশ্ন মানে কিন্তু এই অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় কী আসতে পারে অথবা সাজেশনে কী আছে, ওই টাইপের না। আপনার উদ্দেশ্য এখানে অধ্যায়টা ভালো করে পড়া ও বোঝা, আর তার জন্যই এখানে প্রশ্ন বানাবেন। যেমন ধরুন, প্রশ্ন হতে পারে এমন— এই অধ্যায়ে কী আছে? কী কী বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে? কিসের কিসের ছবি এখানে

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে? এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নতুন কী কী বিষয় আমি জানতে পারছি?

আরও প্রশ্ন করুন, প্রতিটি নতুন বিষয় বা সংজ্ঞা নিয়ে, এটা নিয়ে আপনি ইতিমধ্যেই কী জানেন? নতুন কী পেলেন এ অধ্যায় থেকে? আরেকটা সহজ কায়দা হলো চ্যাপ্টারের প্রতিটি হেডিং বা বোল্ড করা লেখাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন বানান। যেমন ধরেন, একটি অনুচ্ছেদের হেডিং হলো পলাশীর যুদ্ধ। সেটাকে প্রশ্ন বানিয়ে ফেলেন পলাশীর যুদ্ধ কবে কোথায় হয়? কার কার মাঝে হয়? এরকম।

তৃতীয় ধাপ : Reading (পড়া) বাঁচতে হলে জানতে হবে, জানতে হলে পড়তে হবে। তাই এবারে আপনার কাজ হলো প্রশ্ন যা যা বানিয়েছেন, তার জবাব খুঁজতে বসা— একেকটি প্রশ্ন বের করুন আর অধ্যায়ের কোথায় তার জবাব আছে, তা খুঁজে বের করে পড়ে ফেলুন। আন্দাজে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত কোনো অধ্যায় পড়ার বদলে এভাবে গাইডেড রিডিংয়ের সুবিধা কিন্তু অনেক অনেক বেশি— আপনি আগেই জানেন কী পড়ছেন, কেন পড়ছেন, কাজেই পড়ার সময়ে সচেতনভাবেই পড়বেন।

চতুর্থ ধাপ : Recite (মুখে বলুন) পড়া শেষ? এবারে মুখে মুখে বলেন, কী শিখলেন? আসলে জোরে জোরে একা একা পড়তে হবে না, বরং দরকার হলে মনে মনে প্রশ্ন করেন নিজেকে আর জবাবও দেন। অথবা লেখেন। মোদ্দা কথা এখানে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব পড়ে কী শিখলেন, সেটা মুখে মুখে বা মনে মনে/লিখে লিখে দেখেন। এটা করার দরকার হলো মনের ডিস্কে যা ঢুকিয়েছেন বলে ভাবছেন, তা আসলেই ইনপুট হয়েছে নাকি, তা যাচাই করে দেখা।

পঞ্চম ধাপ : Review (যাচাই করা) এবারে যা পড়েছেন বা শিখেছেন, সেটা একটু ফিরে দেখুন। মানে আগের ধাপে তো মুখে মুখে বললেন বা লিখলেন খাতায়। সেটা ঠিকই লিখেছেন বা বলতে পেরেছেন কি না, তা যাচাই করে দেখন অধ্যায়টা আবার পড়ে। নতুন কোনো প্রশ্ন পেলে সেটা প্রশ্নের তালিকায় রাখুন।

এই ধাপটা আসলে এক দিনেই শেষ হয়ে যাবে না; বরং এটাকে প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ে মনের ভেতরে ঢোকাতে হবে ভালো করে। যেমন

গতকাল যা পড়েছেন, তা চট করে রিভিউ করে নিন প্রশ্নগুলো দেখে নিয়ে, সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে এই সপ্তাহে কী কী শিখেছেন, তা রিভিউ করে নিন সেই চ্যাপ্টারের প্রশ্নগুলো দেখে আর উত্তর মনে করার চেষ্টা করুন।

SQ3R-এর মতোই আরেকটা কাছাকাছি কায়দা আছে, যার নাম হলো PQRST টেকনিক। এটার ধাপগুলো হলো—

১. প্রিভিউ (Preview) বা চোখ বুলিয়ে নেওয়া

২. কোশ্চেন (Question) বা প্রশ্ন তালিকা বানানো

৩. রিডিং (Reading) বা পড়া

৪. সামারি (Summary) বা সংক্ষেপে যা পড়লেন তার সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখা

৫. টেস্ট (Test) বা যা পড়েছেন/শিখেছেন, তা কতটুকু ভালো করে শিখেছেন, নিজের কাছে নিজেই পরীক্ষা দেওয়া।

KWL Table তথা KWL ছক পদ্ধতি হলো সহজে বোঝা ও পড়ার আরেকটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য একটি ছক বানিয়ে নিন অনেকটা এরকম করে—

Know	Want	Learned
আপনি এই চ্যাপ্টারের বিষয় সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কী জানেন, কতটা জানেন?	এই চ্যাপ্টার থেকে আপনি কী কী শিখতে চান?	এই চ্যাপ্টার থেকে আপনি কী কী শিখলেন।

এর মধ্যে প্রথম কলামটি পড়া শুরুর আগে চিন্তা করে নেবেন, দ্বিতীয় কলামটি পড়তে পড়তে লিখবেন, আর সবশেষ কলামে লিখবেন এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ কী কী আছে, সেই শব্দ বা কিওয়ার্ডগুলো। আপনার সিলেবাসের প্রতিটি চ্যাপ্টারের জন্য এই কেডব্লুএল ছক রাখবেন। পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার জন্য বা অন্য সময়ে চট করে কিছু মনে করার এই ছকটা অনেক কাজে আসবে।

মনে রাখার সহজ উপায়

পড়া বুঝে মনে রাখার সহজ উপায়টা কী? মুখস্থবিদ্যা কোনো সমাধান না, আর মুখস্থ করা মানে সেটা বোঝা, মনে রাখা কোনোটাই না। কোনো কিছু পড়ে সহজে মনে রাখতে হলে আপনাকে স্মৃতি গড়ার কায়দা জানতে হবে।

পরিচিত অনেক ছাত্রকেই দেখবেন, একবার পড়লেই মনে রাখতে পারে, সেখানে আপনি হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘষটে ঘষটেও কিছু মনে রাখতে পারছেন না।

তাহলে কায়দাটা কী? আঁতেল ভালো ছাত্র কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবে না হয়তো তাদের গোপন রহস্য, তাই এই লেখা থেকে জেনে নিন সেটা।

১. দেখা, দেখতে পারা: কোনো জিনিস মনে রাখতে হলে সেটা দেখা অথবা কল্পনায় করাটা দরকারি। ধরা যাক, মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামল মনে রাখতে হবে। বিরক্তিকর সব জিনিস তোতাপাখির মতো মুখস্থ করার চেয়ে চোখ বুজে একবার সম্রাট আকবরকে কল্পনা করেন, হাতির পিঠে বসে মোগলাই পরোটা খেতে খেতে কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি পরা হিমুর সাথে যুদ্ধ করছে। পানিপথের যুদ্ধ আর তোতার মতো মুখস্থ করা লাগবে না, এই দৃশ্যটা মনে করলেই বাকিটা মনে থাকবে আপনার।

২. সম্পর্ক : কোনোকিছু পড়ার পরে সেটার সাথে আপনার পরিচিত কিছুর সম্পর্কটা চিন্তা করে নিন। যেমন ধরেন— বয়েলের সূত্র দিয়ে গ্যাসের গতিবিধির তত্ত্ব মনে রাখতে হবে। বয়েলের নামটা বয়লারের মতো, তাই না? আবার অনেকটা কয়েলের মতো লাগে। কয়েল থেকে ধোঁয়া-টাইপের গ্যাস বের হয়, তাই না? এভাবে যেটাই পড়বেন, পরিচিত কিছুর সাথে সম্পর্ক বের করেন। আবার যেগুলো পড়ছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বের করেন।

৩. পড়ুন, লিখুন, আঁকুন, মনে রাখুন : পাঁচ মিনিটের বেশি কিছু পড়বেন না। পাঁচ মিনিট পড়ার পরে যেটা পড়লেন, সেটাকে লিখে ফেলেন, অথবা সেটা নিয়ে ছবি আঁকেন। চিন্তার কিছু নাই, ছবি আঁকতে না পারলেও কাকের ঠ্যাং মার্কা কিছু আঁকেন। তার পর পরের পড়ায় যান। কারণ মনে কিছু ঢোকার পরে সেটা যদি লেখার মাধ্যমে হাতে না আনেন, তাহলে মন থেকে কান দিয়ে সেটা বেরিয়ে পালাবেই। তাই পড়া, লেখা, মনে রাখা, এই চক্রে পড়ার অভ্যাস করেন, সহজেই মনে থাকবে সবকিছু।

৪. অল্প অল্পেও অনেক : একবারে গাছের আগায় ওঠা যায় না। তাই একগাদা জিনিস একবারে এক দফায় না পড়ে অল্প অল্প করে পড়েন। মনের জগতে ওভারডোজ সহ্য হয় না।

ব্যস, পেয়ে গেলেন তো ভালো ছাত্রদের গোপন রহস্য! এবারে পড়তে বসে এগুলোকে প্রয়োগ করে ফেলেন, সহজেই মনে রাখতে পারবেন সবকিছু।

মনে রাখার কিছু সহজ পরামর্শ

কিচ্ছু মনে থাকে না?

এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়?

পড়ার পর মনে হয় সব জানেন কিন্তু একটু পরেই দেখেন মাথার ব্যালেন্স ফক্কা?

ওপরের ঘটনাগুলো চেনা চেনা লাগে? অনেক শিক্ষার্থীরই মূল সমস্যা হলো পড়া মনে না থাকা। পড়া গড় গড় করে মুখস্থ করার চেষ্টা করেও একটু পরে বেমালুম ভুলে যায় তারা। আজ পড়লে কালকে মনে থাকে না, কিংবা শুরুতে মনে থাকলেও গায়েব হয়ে যায় মাথা থেকে। কারণটা কী?

আমি পেশায় কম্পুবিজ্ঞানী, তাই কম্পিউটারের ভাষাতেই বলি, এসব সমস্যার মূল কারণ আসলে একটাই— আপনি পড়ে ডেটা ইনপুট করছেন, কিন্তু সেটা প্রসেস করছেন না। ফলে প্রসেস না করা ডেটা আপনার মাথার র‍্যামেই থাকে, দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতির হার্ড ডিস্কে যায় না। ঘুম দিয়ে মাথা রিসেট করলেই সব গায়েব।

তো, এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

খুব সোজা।

কেবল পড়লেই চলবে না, পড়াটার মাঝে মাঝে যা পড়ছেন, সেটাকে একটু প্রসেস করেন। সেটা হতে পারে নানাভাবে—

লিখুন: যা পড়েছেন, সেটা লিখে ফেলেন। ইংরেজিতে পড়লে বাংলায় লেখেন, বাংলায় পড়লে ইংরেজিতে, শুদ্ধ ভাষায় পড়লে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কিংবা এমনকি মুরাদ টাকলা ভাষাতে হলেও লিখুন। মোদ্দা কথা, যেভাবে পড়ছেন, সেভাবে (সেই ভাষায়, কথায়) না লিখে অন্য ভাষায়

অন্য কায়দায় লিখুন। সেটা করতে গিয়ে আপনার মগজে এই পড়ার বিষয়গুলোকে প্রসেস করার কাজটা হয়ে যাবে।

বলুন: যা পড়ছেন, সেটাকে বলুন, নিজের ভাষায়। তবে একা একা না, অন্য কাউকে শোনান। আর কাউকে যদি নাও পান, মোবাইলটা বের করে সেখানে রেকর্ড করে নিজেই শুনে নিন।

চোখ বুজে দেখুন : যা পড়েছেন, সেটাকে নাটকাকারে চিন্তা করে দেখুন। ধরেন আপনি পড়তে চান পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস। চোখ বন্ধ করে পলাশীর যুদ্ধের মারদাঙ্গা একটা নাটকের দৃশ্যাবলি কল্পনা করে নিন পড়ার পরে পরেই। অথবা ডেটাবেজ কী করে কাজ করে, কত প্রকার এগুলোর ওপরে মনের মাধুরী মিশিয়ে একটা দৃশ্য কল্পনা করে নিন।

ওপরের সবগুলো তরিকা আসলে উদাহরণ মাত্র, আপনার পড়ার বিষয়ভেদে একেকটা একেক রকম করে কাজে আসবে, অথবা হয়তো অন্য কোনো পদ্ধতি কাজ দেবে। মোদ্দা কথা হলো আপনি যা পড়ছেন, সেটা নিয়েই বসে থাকবেন না, সেই তথ্যগুলোকে একটু মনের মাঝে প্রসেসিংয়ে পাঠান, তাহলে মগজের র‍্যাম থেকে হার্ডডিস্কে চলে যাবে সেগুলো, অন্তত কয়েক দিন হলেও মনে থাকবে।

মন বসানো মনোযোগ বাড়ানো
এবং গুছিয়ে পরিকল্পনা করা

পড়ায় মন বসানো

পড়ায় মন বসে না, শিক্ষার্থীদের এ এক চিরন্তন অভিযোগ। আর মন বসে না বলে পড়া মাথাতেও ঢোকে না, তা হলো এর ফলাফল।

তাহলে এর সমাধান কী?

পড়ায় মন বসাতে হলে আগে মন কেন বসছে না, তা ভেবে দেখতে হবে। তার পর খুব পরিকল্পিতভাবে সেই কারণগুলো দূর করতে হবে।

কেন পড়ায় মন বসে না? চলুন, দেখা যাক...

১. বাগড়া: আপনার মন কি আশপাশের কিছুতে চলে যাচ্ছে বারবার? ডিস্ট্রাকটেড? পড়ায় মন বসাতে হলে শুরুতেই এ ব্যাপারগুলো দূর করেন। আসলেই যখন পড়তে বসবেন, তখন ফোন বন্ধ করে রাখেন, ফেসবুকে লগআউট এবং পারলে সব রকমের কম্পিউটার বন্ধ করে রাখুন। আপনার পড়া যদি কম্পিউটারে হয়, তাহলে অন্য সব অ্যাপ বন্ধ করে বসুন, ইন্টারনেট কানেকশন অফ করে বসুন। আর যদি ইন্টারনেট লাগেই, তাহলে পড়ার সময়টাতে অন্য সব সাইট বন্ধ করে রাখুন। যেকোনো ব্রাউজারেই কিছু প্লাগিন পাওয়া যায়, যার সাহায্যে বিভিন্ন সাইটে কতক্ষণ যেতে পারবেন তা সেট করে রাখা চলে। (যেমন— ক্রোম-এ Stay Focused)।

মোদ্দা কথা, আপনার মন পড়ার বাইরে যাতে যেতে না পারে, সে জন্য সবগুলো রাস্তা বন্ধ করে বসুন।

২. প্ল্যান করে পড়ুন : পরিকল্পনা করে রাখুন কীভাবে পড়বেন, কখন পড়বেন। আপনাকে সেই সময়ে যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে, সে জন্য সময় বেছে নিন। আবার কোন সময়ে আপনার মন বসে, তাও বের করে নিন। কেউ কেউ কাকডাকা ভোরে ভালো পড়তে পারেন। (আমি জীবনেও তা পারি নাই। সকালে আমার মাথা কাজ করে না।) আবার কেউ

গভীর রাতে ভালো পড়তে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে কোন সময়টা কাজ করে, তা বুঝে নিয়ে সেই সময়ে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করুন। অন্য সব কাজ অন্য সময়ে সেরে ফেলুন, পরিকল্পনাতে সেটাও রাখতে হবে।

৩. পড়ার মোক্ষম সময়কাল: একটানা কয়েক ঘণ্টা পড়ে ফাটিয়ে ফেলবেন, সেটা ভাবাটা ভুল। তাই পড়ার জন্য দেওয়া সময়টাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিন। টানা ১৫-২৫ মিনিটের বেশি পড়লে আপনার বোঝার দক্ষতা কমতে থাকবে। তাই প্রতিবার এতটুকু পড়ার পরে বিরতি নিন, মিনিট খানেক বা পাঁচ মিনিটের জন্য। সেই সময়ে নিজেকে পুরস্কার দিন। (ফেসবুকে যাওয়ার পুরস্কার না, কারণ সেটা করতে গেলে আপনি আর পাঁচ মিনিটে ফিরবেন না তা নিশ্চিত)। পুরস্কারটা হতে পারে কিছু খাওয়া অথবা হেঁটে আসা। কিন্তু ফেরত আসতেই হবে পাঁচ মিনিট পরে, তা নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন।

৪. মনকে বশে আনেন: এটাই সবচেয়ে কঠিন অংশ। মনকে বশে আনতে পারলে মনোনিবেশের জন্য আর কিছু লাগে না। বিদ্যাসাগরের গল্প তো শুনেছেন, রাস্তার আলোয় পড়তেন? অথবা আমাদের হালের শাকিব খান, সিনেমাতে যিনি রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়াশোনা করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন? সেগুলো গল্প হলেও আসলে কিন্তু অন্য সব ডিস্ট্রাকশনকে আপনার মাথা থেকে ডিলিট করে পড়ায় মন দিতে পারেন, যদি মন থাকে আপনার বশে। খেয়াল করে দেখেন, আপনার প্রিয় দলের খেলা যখন দেখেন, তখন কি অন্য কিছু, আশপাশের শব্দ— এসব আপনাকে টিভির পর্দা থেকে নাড়াতে পারে? কারণ আপনার মস্তিষ্ক এ সময়টাতে বাকি সবকিছুকে অফ করে দিয়ে পূর্ণ মনোযোগ একদিকেই দিচ্ছে। পড়ার ক্ষেত্রেও এটা আনতে হবে, যাতে করে খুব শোরগোল কিংবা শব্দের মাঝেও পড়তে পারেন। সেটা এক দিনের না, তবে আয়ত্ত করাও খুব কঠিন কাজ না। অনুশীলনের ব্যাপার। এখনই শুরু করে দিন না। যেটা পড়তে চান, সেটার কথাই শুধু ভাবেন, আর অন্য সবকিছুকে tune out অর্থাৎ মাথা থেকে গায়েব করে দিন। জোর করে হলেও। শুরুতে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে হবে। আর তখনই পড়ায় করতে পারবেন পূর্ণ মনোনিবেশ।

মানসিক স্থিরতা, আবেগকে বশে আনা

পড়ায় মন বসানোর জন্য খুব জরুরি হলো আবেগকে বশে আনা। মনটাকে সুস্থির করা।

কেন? কারণ পড়ায় মন যদি না বসে, মনটা যদি এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে, তাহলে হাজার চেষ্টা করলেও, হাজার ঘণ্টা বসে থাকলেও পড়া আপনার মাথায় ঢুকবে না।

বহুকাল আগের এক বাংলা সিনেমার দৃশ্যটা মনে এল, নায়িকা অনেক পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, যাওয়ার পথে নায়কের সাথে দেখা, নায়ক গুড লাক বলার পাশাপাশি হঠাৎ বলে বসল, 'টরটয়েজ (Tortoise) মানে কচ্ছপ'। উদ্ভট একটা কথা। কিন্তু নায়িকার মাথায় কথাটা ঢুকে আর বেরোবার পথ পেল না। পরীক্ষার হলে লিখতে বসে পড়া মনে আসার বদলে ঘুরতে লাগল এই টরটয়েজ মানে কচ্ছপ। ফলাফল তথৈবচ।

মনকে স্থির করা, অন্য চিন্তা মাথায় না রাখা, এসব কিন্তু খুব সহজ কাজ না। কারণ? কারণ হলো পড়তে বসলে দুনিয়ার সবকিছুর কথা মনে হয়, খেলার মাঠের কথা মাথায় আসে, অথবা গত রাতে দেখা টিভি সিরিয়াল, কিংবা কারও চেহারা।

কিন্তু এটা খুব জরুরি। আসুন, তাহলে দেখা যাক, কী করে মনটাকে স্থির করবেন—

প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার ঠিক করা

পড়তে বশে সবার আগে আপনাকে এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হবে। আপনার প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার কোথায়? এই মুহূর্তে পড়াশোনা করাটা আপনার অগ্রাধিকার, নাকি টিভির কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা, ফেসবুকের আলাপের

কথা— এসব চিন্তা করাটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আগের কাজ তো মানুষে আগেই করে তাই না? যদি পড়াশোনা করাটা আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে কিন্তু অন্যান্য এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসবেই। সে জন্য নিজেকে আগে বোঝান, এখন পড়ার সময়, এখন অন্য কিছুর কথা ভাববেন না। কেবল পড়ার বিষয়টার কথাই ভাববেন। দরকার হলে এ কথাগুলো লিখে রাখেন সামনে, অথবা জোরে জোরে কয়েকবার বলেন।

মাথা খালি করার অনুশীলন

মাথায় এটা-সেটা কিলবিল করছে? খুব স্বাভাবিক। আমাদের সবার মাথাতেই স্টিমুলেশন বা উত্তেজনা নানারকমের চিন্তা দিয়ে ভরিয়ে ফেলে। আর অনেক সময়েই না চাইলেও একই বিষয়ে নানারকমের চিন্তা মাথায় চলে আসে।

এরকম এলোচিন্তা দূর করে কীভাবে মাথাটাকে বশে আনবেন?

খুব সহজ। মাথাটাকে শুরুতে খালি করে নিতে হবে।

শুরুতে ব্যাপারটাকে খুব কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু আদৌ তা নয়। চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করুন। মাথাটাকে একটা বাক্স হিসেবে চিন্তা করে সেটাকে খালি করার কথা ভাবুন। নানা এলোচিন্তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন, এটা ভাবুন, আর মাথাটা খালি হয়ে গেছে, সেটা ভাবুন। মনে মনে ভাবতেও পারেন, আমার মাথাটা এখন খালি হয়ে যাচ্ছে, blank, blank— এরকম। এভাবে ভাবার সময়ে জোর করে কিলবিলে চিন্তা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে মাথায়। জোর করে হলেও সেই চিন্তাকে বের করে দিন। এক মিনিট, দুই মিনিট এভাবে থাকাটা অভ্যাস করুন। দেখবেন মাথা থেকে নানা হিজিবিজি চিন্তা অনেকটা কমেছে।

এবারে পড়তে বসুন যা পড়তে চান তা নিয়ে। পড়ার সময়েও একই কাজ করুন, ভাবুন আপনি অনন্ত জলিল বা এরকম কোনো সিনেমার মারকুটে নায়কের মতো পাহারা দিচ্ছেন, এলোচিন্তা এলেই সচেতনভাবে সেটাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। হাস্যকর মনে হলেও এই কায়দাটা কাজে আসে।

এই কাজটা প্রতিদিন কয়েকবার অভ্যাস করুন। নিয়মিত অভ্যাস করলে দেখবেন খুব সহজেই আপনি বাইরের এলোমেলো চিন্তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারছেন অনায়াসে।

ঝামেলা কমান

পড়ার সময়ে ডিসট্রাকশন বা মনোব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এমন সবকিছুর পথ বন্ধ করে দিন। ফোনটা অফ করে রাখুন। অথবা সাইল্যান্ট। ভালো করে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খেয়ে বসুন, আবার বেশিও খাবেন না। ফেসবুক থেকে লগআউট কিংবা আরও ভালো হয় যদি আইডি ডিএকটিভেট করে রাখতে পারেন। বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করলে সেই সময়ে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট অফ করে রাখেন। আর নেহাত যদি পড়ার জন্য এগুলো খুলতেই হয়, তাহলে নানা সাইট ব্লক করে রাখুন (যেমন— ফেসবুক, ইউটিউব)। প্রতিটি ব্রাউজারেই এরকম এক্সটেনশন পাওয়া যায়, যা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি নানা সাইট ব্যবহার করা বন্ধ করে রাখা যায়। যেমন— Stay Focused। এগুলো ইন্সটল করে নিন, যাতে করে মনের ভুলেও নানা পড়ায় বিঘ্নকারী বা সময় নষ্ট করার সাইটে যেতে না পারেন।

শব্দদূষণ রোধ

পড়ার সময়ে আশপাশের কথাবার্তা, পাশের রুমের টিভি, এসবে পড়তে সমস্যা হতেই পারে। সে জন্য একটা কায়দা হলো মিউজিক ছেড়ে রাখা। অথবা নিঃশব্দ পরিবেশ তৈরি করা। বাজারে কতগুলো হেডফোন পাওয়া যায়, যা দুই কানকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে। সেরকম হেডফোন দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন। চারদিকের শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে।

পড়া ভালো লাগানোর উপায়

পড়তে ভালো লাগে না?

অসহ্য লাগে?

কবে এই পড়ার থেকে মুক্তি পাবেন, তার দিন গোনেন?

আপনি একা নন। অধিকাংশ মানুষের কাছেই চাপিয়ে দেওয়া পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না। কিন্তু পড়তে যদি ভালো না লাগে, আপনার মন অবচেতনভাবেই কিন্তু সেই পড়ার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুকে মগজের ভেতর থেকে ধাওয়া দিয়ে তাড়াবে।

পড়ালেখায় ভালো করতে হলে তাই পড়ার বিষয়টাকে ভালো লাগাতে হবে।

বলা তো খুব সহজ, কিন্তু কীভাবে?

কেন পড়ছেন, সেটা চিন্তা করেন

আপনি কেন পড়ছেন?

পুরো ব্যাপারটাকে একটা লেনদেন হিসেবে ভাবেন। আপনি কিছু একটা চান। সে জন্য এখন আপনাকে খাটতে হচ্ছে। এই কিছু একটা হতে পারে পরীক্ষায় পাস করা, পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে থেকে পাস করা, অথবা পরীক্ষায় সবার ওপরে থেকে পাস করা। আরও হাই লেভেলে ভাবলে পরীক্ষায় পাস করে ডিগ্রি পাওয়া, অথবা আপনার আকাঙ্ক্ষিত পেশায় যাওয়া।

একটা ব্যবসায় কিছু লাভ করতে হলে, কিছু পেতে হলে, অনেক কিছু বিনিয়োগ করতে হয়। ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখুন। আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক, আপনি যা চান তা পেতে হলে আপনাকে পড়তে হবে। কাজেই পড়াটাকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে না দেখে শুরুতেই করতে হবে

লাভ-ক্ষতির হিসাব।

পড়লে কী হবে?

না পড়লে কী হবে?

এই জিনিসগুলোকে লিখে ফেলেন খাতা-কলমে। তার পর সেদিকে তাকিয়ে থাকুন কিছুক্ষণ। আগ্রহে না হোক, ঠেলার নাম বাবাজি এই জন্যেও অন্তত পড়ার অনুপ্রেরণা পাবেন।

পড়াশোনাকে আনন্দময় করে তোলা

ভয় দেখিয়ে না হয় পড়ার লাইনে এলেন, কিন্তু পড়াটাকে যদি ভালো না-ই লাগে, তাহলে কিন্তু কাজ হবে না। সে জন্য আপনার এর পরের কাজ হবে পড়ার মাঝে আনন্দের, মজার কিছু খুঁজে নেওয়া।

কীভাবে? আপনি নির্ঘাত ভাবছেন, বোরিং সব বিষয়। যেমন— গণিত, কিংবা বাংলা ব্যাকরণ, এসবের মাঝে মজার কিছু কি পাওয়া সম্ভব?

অবশ্যই সম্ভব।

কেবল আপনার মাথাটাকে আরেকটু খাটাতে হবে। কোনো কিছু পড়ার সময়ে সেটাকে নিয়ে একটা ছোটখাটো নাটক কল্পনা করে নিন। যেমন— বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে পড়ছেন? তাহলে একটা নাটকের দৃশ্য ভাবুন, যেখানে সাজগোজ করা সিংহাসনে বসা রাজামশাই ব্যাকরণের সন্ধি-সমাস নিয়ে আলোচনা করছেন অমাত্যদের সাথে। কিংবা গণিত? চৌবাচ্চার অঙ্ক করতে গিয়ে চৌবাচ্চার কথা ভাবুন, আঁকার ঝোঁক থাকলে চৌবাচ্চাটার একটা ছবি আঁকুন। কিংবা রসায়ন পড়ছেন, তাহলে কেমিক্যাল রিএকশন মুখস্থ করতে মঞ্চে নানা রঙের পোশাক পরা সব যৌগরা নাচানাচি করছে, এমন একটা দৃশ্য মনে মনে ভাবুন। মোট কথা, আপনার পড়ার মাঝে যদি মজা না থাকে, তাহলে নিজেই সেই মজাদার দৃশ্যটা বানিয়ে নিন। কল্পনার লাগামটা দিন ছেড়ে।

মনোযোগ বাড়ানোর কৌশল

পড়ায় মন বসে না, এই যদি হয় আপনার বড় একটি সমস্যা, তাহলে ভয় পাবেন না, আপনি একা নন, মনোযোগের অভাব কিন্তু প্রায় সব মানুষের মাঝেই আছে। সে পড়ার বিষয় হোক কিংবা অন্য কিছু। আর আজকাল মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইন্সট্যান্ট মেসেজিং এসবের আমলে তো মনোযোগের বেজেছে বারোটা।

কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই আপনি এই সমস্যাটা কাটাতে পারেন। মনোযোগ বাড়াতে হলে মনটাকে স্থির করতে হবে সবার আগে, যা আরেকটি অধ্যায়ে বলেছি। সেটা ছাড়াও ধাপে ধাপে মনোযোগ বাড়ানোর অনুশীলন করতে হবে। আসুন, দেখা যাক, মনোযোগ বাড়ানোর কিছু কায়দার কথা—

১. থামো!!!: পড়তে বসে বা ক্লাসে লেকচার শুনতে গিয়ে যদি টের পান, মন চলে যায় হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, তাহলে ঝটকা মেরে নিজের মনোযোগ ফেরানোর অভ্যাস করুন। একা ঘরে পড়ার সময়ে দরকার হলে জোরে জোরেই বলুন, থামো!!, মনোযোগ দাও!! স্টপ! একা একা কথা বলছেন দেখে কে কী ভাববে তা নিয়ে ভয় পেলে এটা মনে মনেও বলতে পারেন। মোদ্দা কথা, মনটা পিছলে পড়তে শুরু করলেই এক টান দিয়ে পড়ার দিকে জোর করে ফেরান।

২. অগ্রাহ্য করুন: আপনি যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং দেখেন, তখন কীভাবে দেখেন একটু খেয়াল করুন তো। আপনার চোখ কোথায় থাকে? নিশ্চয়ই ব্যাটসম্যানের দিকেই, তাই না? সেই সময়ে পাশের ফিল্ডার নাক চুলকাচ্ছে, আম্পায়ার কান চুলকাচ্ছে কি না, এগুলো কি আপনি খেয়াল করেন? কেন করেন না? কারণ আপনি যখন ব্যাটিং দেখছেন, তখন আপনার নজর-মনোযোগ সবটা টানেল ভিশনের মতোই, ব্যাটসম্যান বাদে বাকি সবকিছু আপনি অগ্রাহ্য করছেন, আপনার চোখে পড়ছে ঠিকই কে

কী চুলকাচ্ছে, কিন্তু আপনার মন সেটাকে অগ্রাহ্য করছে মূল জিনিস দেখার জন্য। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এরকমই: মনোযোগ বাড়ানোর জন্য পড়ার বিষয় ছাড়া আর সবকিছু অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করুন।

৩. সুচিন্তা/কুচিন্তা/দুশ্চিন্তার সময় আলাদা করে রাখুন: পড়তে গিয়ে পড়া বাদ দিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে? নিজের মনকে অনাহারে রাখার বদলে বরং মনকে বলে দিন, এই চিন্তা করার জন্য আলাদা সময় রাখবেন, সেই সময়েই এই চিন্তা করবেন। যেমন ধরেন, মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে এই চিন্তা আপনার মাথায় সব সময় ঘোরে, দিনের মধ্যে ১০ মিনিট এই দুশ্চিন্তার জন্য বরাদ্দ করেন, বাকি সময়ে মনে চিন্তা এলে মনকে বলে দিন, ওই অতটা বাজে টাক পড়া টাইমে এ নিয়ে চিন্তা করবেন, এখন সময় নাই, খোদা হাফেজ টাক্কু চিন্তা। আবার টাকাপয়সার চিন্তা কিংবা খেলা নিয়ে চিন্তা— এসবের জন্য পড়ায় বিঘ্ন ঘটলে বরং সেসবের জন্যও আলাদা চিন্তা-টাইম বরাদ্দ করে রাখুন। মোট কথা, পড়তে গিয়ে মন ছুটে গেলেই মনকে বলবেন, এলোচিন্তাটা পকেটে রেখে দিতে, যথাসময়ে সেটা নিয়ে ভাববেন।

৪. মাথা জ্যাম হয়ে গেলে বিরতি নিন: পড়তে পড়তে মাথা আটকে স্থবির হয়ে যেতেই পারে। মাথা কাজ করছে না, তাই মনও বসছে না, সেই অবস্থায় পড়লে বরং ঘষটে ঘষটে পড়ার চেষ্টা না করে একটু ছোট্ট বিরতি নিন। মিনিট খানেক হেঁটে আসুন, অথবা বাথরুম থেকে চোখেমুখে পানি দিয়ে আসুন।

৫. আস্তে আস্তে মনোযোগের পরিধি বাড়ান: শুরুতে হয়তো একটানা দুই-তিন মিনিট গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে পারবেন, কিন্তু তার পরেই মন ছুটে যাওয়া শুরু করবে। সে ক্ষেত্রে 'থামো' সিস্টেমে মনকে ফিরিয়ে আরেকটু সময় মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে গভীর মনোযোগের পরিধিটা বাড়াতে থাকুন।

পরিকল্পনার পরি, দিশাহারার দিশা আর ঘুম আনয়ক নাকেতেলগরিদম

সামনে পরীক্ষা, ডেডলাইন কিংবা কাজের/প্রজেক্টের চাপ? অসংখ্য চিন্তা কিলবিল করছে মাথায়। ঘুমাতে পারেন না টেনশনে, অথবা হাজারো পরিকল্পনার চাপে হারিয়ে ফেলেছেন দিশা?

ফেসবুকের সুবাদে প্রচুর শিক্ষার্থী তাদের নানা সমস্যার কথা আমাকে লেখেন। আমার ক্ষমতা সীমিত, সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার উপায় নাই, তবে একটা সমস্যাতে ছাত্র বা পেশাজীবী অনেকেই ভোগেন, তা হলো অসংখ্য কাজের ভিড়ে দিশা হারিয়ে ফেলা, আর কীভাবে শুরু করবেন তা না বোঝা। এটা কেবল পড়ালেখা বা চাকরি না; বরং জীবনের সব ক্ষেত্রেই হয়, খেয়াল করে দেখুন আজ হোক বা গতকাল পরশু, আপনি নিজেও কিন্তু ভুগেছেন এহেন সমস্যায়। ঘুমাতে যাওয়ার সময়ে অনেক পরিকল্পনা হয়তো করেন, কিন্তু চিন্তার টেনশনে পরি যায় চলে উড়ে, কাজ শেষ করাটা তাই হয়ে যায় কেবলই কল্পনা।

কোথা থেকে শুরু করবেন? কীভাবে শুরু করবেন? এই প্রশ্ন যদি আপনার মাথায় বাঁধিয়ে দেয় জিলাপির প্যাঁচ, তাহলে এই পরামর্শটা আপনার জন্য।

কম্পিউটারবিজ্ঞানী হিসেবে জব শিডিউলিং এলগরিদম শিখতে হয়েছিল শুরুতেই। তো, আমরা তো কম্পিউটার না, ঘুমের সমস্যা কম্পিউটারের না, হয় আমাদেরই। তবে কম্পিউটারের কাছ থেকে বুদ্ধি টুকে নিতে তো সমস্যা নাই। তাই চলুন দেখি, তিনটি ধাপে কীভাবে ফিরে পাবেন আপনার দিশা—

১. তালিকাবাজি

আমার এক বন্ধু ডায়েরি হাতে ঘুরত আর তালিকা বানাত। তখনো ট্যাবলেটের যুগ আসেনি। সে সময় তাকে নিয়ে হাসলেও এখন বুঝি, তার

এই তালিকাবাজিটা আসলে খুব কাজের একটা জিনিস।

সবার আগে তাই খাতাকলম নিয়ে পড়ুন বসে। আপনার এড়-উড় বা কর্তব্য তালিকা বানিয়ে ফেলুন। 'মাথায় আছে' 'কাগজে লেখার দরকার নাই'— এসব কথা অতিচালাক লোকজন বলে থাকে, এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিন। কারণ মানুষের মাথায় একসাথে খুব অল্প জিনিস থাকতে পারে। (বাজারের ফর্দ না নিয়ে বাজারে গেলেই আশা করি বুঝবেন কত জিনিস ভুলে গেছেন)।

আর এই তালিকা কম্পিউটারেও না, ছেঁড়া কাগজেও না; বরং করুন একটা খাতায়। (আমার ছাত্রদের জন্য কড়া নির্দেশ— কখনো যেন কাগজের শিটে কিছু না লেখে, কারণ সেটা অবধারিতভাবে হারাবেই, লিখতে তাই হবে ডায়েরি বা খাতায়)।

শুরুতে অতশত চিন্তার দরকার নাই; বরং মাথায় যা কাজের তালিকা আসে, লিখতে থাকুন। অবাক হয়ে দেখবেন, হাজার খানেক না হলেও লিখতে লিখতে হয়ে গেছে ৫০টার মতো কাজ!

২. গুরুত্ব মাপুন

সব কাজের গুরুত্ব সমান না। কোনো ডেডলাইন ধরতে না পারলে পরীক্ষায় ফেল করবেন, বা চলে যাবে চাকরি, আর কোনো কাজে যেমন অমুক সিরিজের সাম্প্রতিক পর্বটি না দেখতে পারলে হয়তো হবে না তেমন একটা কিছু (পাখির দর্শক টাইপের সিরিয়ালখোরদের কথা অবশ্য আলাদা)। তাই এবারে তালিকাটা নিয়ে অন্য কালির কলমে চিহ্নিত করে তিন ভাগে ভাগ করুন কাজগুলো।

—(এখনই) এখনই করা লাগবে, না করলে ভয়াবহ বিপদ

— (কালকে) কালকে করলেও চলে, তবে এই সপ্তাহে করা গেলে ভালো

— (কখনো) কখনো সময় পেলে করা যাবে,

৩. করে দিন শুরু

তালিকা বানিয়ে গুরুত্ব মাপার কাজ শেষ? তাহলে বসে আছেন কেন? তাহলে আপনার তালিকার গুরুত্ব বুঝে কাজ শুরু করে দিন। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েই শুরু করুন। তালিকার দিকে তাকালেই বুঝবেন ঘুম হারানোর মতো কতটা কাজ বাকি আছে। সেগুলো করে তারপর নাকে তেল দিয়ে ঘুমান। কালকের কাজ নিয়ে আজকে ঘুম হারাবার দরকার নাই। আর কখনো-তালিকার কাজগুলোকে নিয়ে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখেন। ঘুমটা ভালো হবে।

ব্যস, খুব সহজ সরল তিন স্টেপের পরামর্শ। এটাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করুন। খেয়াল রাখবেন, কাগজে-কলমে তালিকাটা বানানো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাইপ করে বা কপি পেস্ট করে তালিকা বানালে কোনো কারণে তালিকার কাজগুলোর গুরুত্ব ঢোকে না মাথায়, আদিকালের কাগজকলম আর নোটবুকের তালিকাই অনেক বেশি কাজে আসে।

আর তাই নাই চিন্তা, টেনশন, এই তেলগরিদম নাকে দিয়ে ঘুমান নিশ্চিন্তেই...

পোমডরো টেকনিক

পড়ায় বসে না মন? বিরক্তিকর সব পড়াশোনা অথবা একঘেয়ে কাজ করতে গেলে পায় বেজায় ঘুম? অথবা ধরে যায় মাথা কিংবা মন চলে যায় হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথাও?

তাহলে আমার এ লেখাটা, আপনার জন্যই।

নিউরোবিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে একটা ইন্টারেস্টিং গবেষণা করেছিলেন। কিছু ছাত্রকে তাদের খুব অপছন্দের কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে দিয়ে তাদের মস্তিষ্কের ওপর রাখছিলেন নজর। কী আশ্চর্য, অল্প একটু পরেই দেখা গেল, ব্যথা পেলে মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশের পেইন রিসেপ্টর স্নায়ুকোষ সক্রিয় হয়ে ওঠে, বিরক্তিকর পাঠ্যবই পড়তে গিয়ে ছাত্রদের একই রকমের ব্যথা হচ্ছে।

কাজেই ভ্যানভ্যানানি পড়া পড়তে গেলে মাথায় যদি করে ব্যথা, সেটা পড়া ফাঁকি দিতে আপনার আলসেমি বা অজুহাত না; বরং সেটা আপনার দেহের-মনের কড়া প্রতিবাদ— এই চাপিয়ে দেওয়া বিরক্তিকর পড়ার বিরুদ্ধে।

কিন্তু? পাস তো করতেই হবে পরীক্ষায়। অথবা অফিসের বসের দেওয়া কাজটা করতে হবে শেষ? তবে উপায় কী?

আছে। মনকে ফাঁকি দেওয়ার কায়দাটা আছে। চলুন, দিই শিখিয়ে।

পোমোডরো টেকনিক

কায়দাটা খুব সহজ। পড়া বা এরকম আর কোনো কাজকে ২৫ মিনিটের খণ্ডে ভাগ করে নিন। ঘড়িতে বা মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করুন ঠিক ২৫ মিনিট পরে। এর বেশিও না, কমও না। এবং অন্য সবকিছু বন্ধ করে ২৫ মিনিট ধরে কাজটা করুন। যেই মাত্র অ্যালার্ম বাজবে, অমনি কাজ বন্ধ।

মিনিট পাঁচেক, দশেক হাওয়া খান, চা খান, সেলফি তুলুন, মন যা চায় তা-ই করুন। তার পর আবারও ২৫ মিনিটের অ্যালার্ম।

এর কারণটা কী? কারণ হলো বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ২৫ মিনিটের মাথাতেই ব্রেইনের নিউরনগুলোতে বিরক্তিকর পড়ার প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হয়ে যায় ব্যথা, আর আপনিও বিরক্ত হয়ে দেন ছেড়ে হালটা। কাজেই ঠিক ২৫ মিনিটের মাথায় যদি অপছন্দের কাজটা থামিয়ে দিতে পারেন, তাহলে নিউরনগুলো থাকবে খোশ মেজাজে। মনকে পারবেন ভোলাতে।

আপনিও থাকবেন মেজাজে বেজায় খোশ।

কাজটাও হবে, যতই বিরক্তির হোক না কেন।

মন ভোলানোর এই টেকনিকের নাম? পোমোডরো টেকনিক (Pomodoro technique)।

আজই তাহলে দেন শুরু করে। আর দেরি কেন?

পরিকল্পনা : নয় শুধু কল্পনা
পরিকল্পনা করার কার্যকর পদ্ধতি

কাজের তালিকা, কখন কী পড়বেন, সেই পরিকল্পনা, তালগোল পাকিয়ে গেছে?

তাহলে শুনুন গুগলে ব্যবহৃত একটি খুব সহজ কায়দা।

বছর সাতেক আগে গুগলে কাজ করেছি ইন্টার্ন হিসেবে, মাস তিনেকের জন্য। গুগলকে প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র বলা চলে, তাই সেখানকার সবকিছু খুব প্রযুক্তিনির্ভর হবে বলে মনে হয়। তাই ভাবলাম কোনো ভার্চুয়াল রিয়ালিটি টাইপের কিছু দিয়ে বানানো হয়তো চমকপ্রদ কোনো To-Do list আমার গ্রুপে থাকবে, আগামীর সব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখা যাবে, আর সব মুশকিল হবে আসান।

কিন্তু প্রথম সপ্তাহেই ধারণাটা গেল পাল্টে।

আমার গ্রুপের To-do list? রুমের দেয়ালের একটা অংশে সেটা লাগানো, তবে খুব হাই-টেক কিছুর বদলে সেটা কী দিয়ে তৈরি?

পোস্ট ইট নোটের চিরকুট দিয়ে।

খুব সহজ একটা ডিজাইন— দেয়ালে মার্কার দিয়ে দুইটা দাগ টেনে তিন ভাগ করা।

— প্রথম ভাগ হলো— Must— আগামী সপ্তাহে কোন কাজ, কী করতে হবে অবশ্যই

—দ্বিতীয় ভাগ হলো— Maybe— আগামী সপ্তাহে প্রথম ভাগের কাজ শেষ হয়ে গেলে কোন কাজ করা হবে

— তৃতীয় ভাগ হলো— Sometime — আগামী সপ্তাহে নয়, বরং নিকট ভবিষ্যতে কী কী কাজ করতে হবে।

আর এটা রক্ষণাবেক্ষণও খুব সোজা। কাজের তালিকাকে ছোট ছোট পোস্ট-ইট চিরকুটে লিখে ফেলি। প্রতি চিরকুটে ছোট্ট একটা কাজের নাম। তার পর সেগুলোর গুরুত্ব অনুসারে তিন এলাকার কোনো একটাতে লাগানো। প্রতি সপ্তাহের শেষে, যেসব কাজ হয়ে গেছে, সেই চিরকুট ফেলে দেওয়া, আর যেগুলো এখনো হয়নি, সেগুলোকে অন্য কোনো ঘরে সরানো, এটুকুই কাজ।

কিন্তু সুবিধাটা অনেক বেশি। দেয়ালে তাকালেই চোখের সামনে এক নজরে পড়ছে কী কী কাজ আছে। আর সেগুলোকে সাজানোটাও এক মুহূর্তের কাজ।

আমাদের সব কাজ, সব সমস্যার জন্য জটিল প্রযুক্তির সমাধান লাগে না, বরং সহজ পুরোনো অনেক কিছু দিয়েই তা করা সম্ভব।

তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে মনে রাখুন— KISS প্রিন্সিপল, অর্থাৎ, Keep It Simple, Stupid নীতিমালা।

পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা

পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা

পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে চরম আরাধ্য। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন জনপ্রিয় নোটবই ছিল 'উচ্চ নম্বরের সিঁড়ি'। ভাবখানা পড়লেই ভালো নম্বর পাওয়া যাবে! জানি না সেই সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠতে পেরেছে কি না। তবে প্রথাগত পরীক্ষা যেহেতু আমাদের দেশে আরও অনেক দিন আছে, তাই সেই পরীক্ষায় ভালো ফল করার উপায় সম্পর্কে অনেকেই জানতে চান আমার কাছে। আমি এক সময়ে এসব পরীক্ষা পার হয়ে এসেছি, কাজেই তার ভিত্তিতে পরীক্ষায় ভালো করার কিছু ছোটখাটো সাজেশন লেখার দুঃসাহস দেখাতে চাই।

১. পরিষ্কার করে লেখা : হাতের লেখা ভালো হতে হবে এমন কথা নাই। তবে হাতের লেখা পরিষ্কার হতে হবে। আমার হাতের লেখা ছোটবেলা থেকেই ভয়াবহ। কিছু লিখলে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার মতো চিঠির সাথে করে পড়ে দিয়ে আসতে হয়— এমন ভয়াবহ। (ঘটনাচক্রে আমার চাচা/কাজিনেরা অনেকে আবার হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, হা হা হা) । এর পরেও হাতের লেখার কারণে সমস্যা হয়নি। কারণ পরীক্ষার খাতায় স্পষ্ট করে লিখতাম। লাইন ধরে লেখার জন্য স্কেল ধরে লিখতাম, তাতে করে কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং লেখাও স্পষ্ট দেখাত।

পরে পরীক্ষক হয়ে বুঝেছি, পরীক্ষকদের কতটা কষ্ট হয় অস্পষ্ট লেখা পড়তে। কাজেই পরীক্ষকদের প্রতি সদয় হোন। হাতের লেখা মুক্তার মতো হওয়ার দরকার নাই, পড়া গেলেই হবে।

২. কখনো কিছু ছেড়ে আসবেন না : পরীক্ষার খাতা খালি দিয়ে আসার চেয়ে কিছু লিখে আসা অনেক ভালো। হারানোর তো কিছু নাই, তাই না? খালি খাতা দিলে নিশ্চিত ০ পাবেন। তার চেয়ে কিছু তো লিখে আসেন!

৩. নিশ্চিত প্রশ্ন সবার আগে : যেটা পারবেন, সেটা আগে করবেন। জটিল কাজ আগে করে লাভ নাই।

৪. খাতায় নামধাম লিখতে ভুলবেন না কিন্তু।

৫. গাদা গাদা লুজ শিট নেওয়ার প্রতিযোগিতা বাদ দিন। আরবি পরীক্ষা বা বাংলা পরীক্ষায় অনেক সময়ে পরীক্ষকেরা খাতার পৃষ্ঠা গুনে নম্বর দেন। কিন্তু সেগুলা বাদে বাকি পরীক্ষায় অতিরিক্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে পাতার পর পাতা ভরানোর মানে নাই।

৬. সময় মেপে কাজ করুন। ছয়টা প্রশ্নের জন্য তিন ঘণ্টা সময় থাকলে অবশ্যই ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রশ্নপিছু ২৫-২৮ মিনিট ধরে লিখুন। অবশ্য কাঁটাওয়ালা ঘড়ির মতো ইম্প্র্যাকটিকাল জিনিস না, ডিজিটাল ঘড়ি নিয়ে পরীক্ষা দেবেন, যাতে নিখুঁতভাবে সময়ের হিসাব থাকে।

৭. এবং পরীক্ষা শেষে কোনটা ঠিক হলো, কোনটা ভুল হলো, তার হিসাব করা একেবারেই বাদ দিন। আপনার বন্ধুর ১০টা হলে আপনার যদি হয় চারটা, সেটা জেনে কী করবেন? সেটা জানার চেয়ে না জানাই ভালো। তাই পরীক্ষা শেষে প্রশ্নটাকে নির্বাসনে পাঠান। প্রশ্ন নিয়ে চিবিয়ে খেলেও যা লিখে এসেছেন ও যা পাবেন, তা তো আর পাল্টাবে না, তাই না?

গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি আমার পছন্দ না, তবে সেটা যেহেতু রাতারাতি পাল্টাবে না, কাজেই আশা করি ওপরের সাজেশনগুলো পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগবে।

পরীক্ষায় ভালো করার উপায়

পরীক্ষা! আপনি চান বা না চান, পরীক্ষায় বসতেই হবে। সে স্কুলের পরীক্ষা হোক কিংবা কলেজের বা ভর্তির অথবা চাকরির।

কী করে পরীক্ষায় ভালো করবেন? ধরা যাক আপনার স্কুল বা কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষা দিতে হবে আজ থেকে এক বছর পরে। কীভাবে এই একটি বছর ধরে প্রস্তুত হবেন পরীক্ষাটার জন্য? আজকে সেটা নিয়েই লিখছি কিছু পরামর্শ।

১. পরিকল্পনা করুন, ভালোভাবে

প্রথমেই আপনাকে বসে হবে খাতা-কলম নিয়ে। পরীক্ষার কয়দিন বাকি, আর আপনার সিলেবাসটা কী, তা লিখে ফেলুন। এরপর এই সিলেবাস পড়তে কতটা সময় লাগতে পারে, তার হিসাব করুন। সব বিষয় পড়তে সমান সময় লাগবে না, কঠিন জিনিস পড়তে বেশি সময় লাগবে, সহজ জিনিসে অল্প, কাজেই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে সময় বের করুন। তবে সেই হিসাবে কিছু অতিরিক্ত সময় হাতে রাখতেই হবে। যেমন— আপনার যদি মনে হয় কোনো বিষয় পড়তে দুই সপ্তাহ লাগবে, বাস্তবে তার জন্য বরাদ্দ করেন তিন সপ্তাহ।

২. অনুশীলন করুন, নিয়মিত

কোনো বিষয়ে দুর্বলতা থাকলে তা ঠিক করতে নিয়মিত অনুশীলন করুন। যেমন ধরা যাক আপনার কোনো রকমের অঙ্ক করতে অনেক বেশি সময় লাগে। তাহলে ঠিক করেন, প্রতিদিন ১০ মিনিট সেই টাইপের অঙ্ক করার পেছনে দেবেন। (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই অংশটা লেখা। কলেজে পড়ার সময়ে ক্যালকুলাসের অঙ্ক করতে অনেক সময় লাগত। সে সময় প্রায় চার মাস ধরে প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে সোয়া তিনটার মধ্যে রীতিমতো স্টপওয়াচ ধরে অঙ্ক অনুশীলন করতাম, ফলাফল হলো এইচএসসি এবং পরে

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা— দুই জায়গাতেই ক্যালকুলাসের সমস্যাগুলো প্রচণ্ড দ্রুততার সাথে করতে পেরেছিলাম, যা ফলাফলে খুব কাজে এসেছিল)।

৩. ঝুটঝামেলা, সমস্যা দূর করুন

আপনি ভালো ফল চান, তা ঠেকাচ্ছে কী কী সমস্যা? হাতের লেখা খারাপ? সময় পান না? মনে থাকে না? বোঝেন না?

কেন ফল খারাপ হয় তা বোঝার চেষ্টা করুন, আর শুধু তা-ই না, সমস্যাগুলোকে লিখে ফেলুন তালিকা আকারে। দুনিয়ার সব সমস্যারই সমাধান আছে, সোজা পথে না হলে অন্যভাবে। হাতের লেখা খারাপ হলে লেখার পদ্ধতিটাই পাল্টে ফেলুন। অথবা কারও হাতের লেখা ভালো হলে তাকে কপি করে ফেলুন। লেখার গতি কম হলে দ্রুত লেখার জন্য প্রতিদিন লেখার অভ্যাস করুন। মনে না থাকলে এই সিরিজের অন্য পর্বে স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর যা কৌশল বলেছি, কিছু না কিছু খাটান। মোটকথা, সমস্যা আছে সমস্যা আছে বলে চিল্লাচিল্লি না করে খাতা-কলমে তালিকা করে ফেলুন, তার পর সিস্টেম্যাটিকভাবে সেগুলো একটা একটা করে সমাধান করুন।

৪. নিজের অগ্রগতির হিসাব রাখুন

শুরুতেই বলেছিলাম পরিকল্পনা করার কথা। কিন্তু শুধু পরিকল্পনা করাটা আসলে যথেষ্ট না। আপনি কি লাইনে আছেন? ঠিকমতো আগাচ্ছেন? সেটা বুঝতে হলে নিয়মিতভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে হবে। কাজেই আপনার পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ কীভাবে মূল্যায়ন করবেন, তাও ঠিক করে রাখুন। যেমন ধরুন, আপনি গণিতের পরিকল্পনা করছেন। কোনো রকমের অঙ্ক কত মিনিটের মধ্যে করতে পারলে বুঝবেন আপনার সেই অঙ্ক নখদর্পণে এসেছে, তা ঠিক করে রাখুন, আর তালিকায় সেটা লিখেও ফেলুন। অথবা ধরা যাক ব্যাকরণ পড়ছেন, কতটুকু সময়ে ব্যাকরণের কোনো রকমের প্রশ্নের জবাব লিখে ফেলতে পারবেন, সেটা আগে থেকে লিখে রাখুন। যখন আসলেই এই মূল্যায়ন পরিকল্পনা মাফিক পাস করবেন, নিজের পরীক্ষাতে নিজেই সফল হবেন, তখনই পরিকল্পনার সেই অংশটি সফল হয়েছে বলে ধরে নেবেন। মোট কথা, নিজের সন্তুষ্টির ওপরে নির্ভর না করে নিজেই নিজের পরীক্ষা নিয়ে বুঝে নিন, আপনি সেই অংশে দক্ষ হয়েছেন কি না।

আশা করি ওপরের পরামর্শগুলো মেনে চললে আসন্ন পরীক্ষাতে আপনিও পাবেন কাঙ্ক্ষিত ফল।

পরীক্ষার প্রস্তুতি

ধেয়ে আসছে পরীক্ষা। আর মাত্র অল্প কিছু সময় বাকি, সেটা হতে পারে মাস তিনেক কিংবা এক মাস অথবা দুই সপ্তাহ। এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি কীভাবে নেবেন, এই অনুচ্ছেদের মূল প্রতিপাদ্য সেটাই।

গোছানো, পড়া, অনুশীলন, রিভিশন

পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রথম কাজ হলো বুক ভরে বড় একটা শ্বাস নেওয়া, আর তার পর কবে কোথায় কী পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেটা সাদা কাগজে বড় করে লিখে ফেলা। এই কাগজটা দেয়ালে চোখের সামনে লাগিয়ে রাখুন। দিয়েছেন? এবারের কাজ হলো এই পরীক্ষায় আপনি কী ফল চান, সেটাও লিখে ওই কাগজটার নিচে লাগানো।

একেকজন পরীক্ষায় একেক ফল চায়। কেউ চায় টেনেটুনে পাস করতে, কেউ আবার ভালো ফল নিয়ে পাস করতে, আবার কেউ চায় একেবারে প্রথম হয়ে পরীক্ষায় পাস করতে। আপনাকে শুরুতেই ঠিক করে নিতে হবে আপনি কোনটা চান, আর সেটা কতটুকু বাস্তব।

এ ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলার পরের কাজ হলো আপনার এই লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য যা যা করা লাগবে, তার তালিকা করা। তালিকায় লিখুন

১. পরীক্ষার সিলেবাস

২. কী কী বই পড়তে হবে

৩. কী কী আনুষঙ্গিক নোট/রেফারেন্স পড়তে হবে

৪. পরীক্ষার হলে কী কী জিনিস নিতে পারবেন

৫. পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র— এসবের তালিকা করে ফেলা।

আর তালিকার জিনিসগুলো কোথা থেকে জোগাড় করবেন, সেটাও মাথায় রাখা।

শুরুর কাজটা তো হলো, এবারে আপনার প্রথম কয়দিনের কাজ হবে তালিকার এই জিনিসগুলো জোগাড় করে ফেলা। এই সময়টাতেই আরও বড় একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, তা হলো সিলেবাস অনুসারে রুটিন করে ফেলা।

রুটিন করার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন— মোট সময় যা বাকি আছে, তার ৫০ শতাংশ সময় পড়বেন, ২৫ শতাংশ সময় সেটা রিভিশন দেবেন, ২০ শতাংশ সময় পরীক্ষার প্রশ্ন অনুশীলন করবেন ঘড়ি ধরে টাইম মোডে, আর বাকি ৫ শতাংশ সময়? সেটা হাতে রাখবেন, কোনো অংশে অতিরিক্ত সময় লেগে গেলে সেটা পুষিয়ে নিতে।

যেমন ধরুন, আপনার পরীক্ষার আগে যদি এক মাস সময় থাকে, তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে সিলেবাস শেষ করবেন, ছয়-সাত দিন রিভিশন, পাঁচ-ছয় দিন রিটেন টেস্ট লিখে সমাধান করা— এভাবে রুটিন করে নিন।

ঘুমানো

না ঘুমিয়ে পড়া মাথায় রাখার ব্যাপারটা সুপারম্যানের কিংবা অনন্ত জলিলের কাজ। আপনি সেই রিস্ক নেবেন না কিন্তু। একজন মানুষের ঘুম লাগে অন্তত দিনে আট ঘণ্টার মতো। স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ার সময় আরও ঘণ্টা খানেক বেশিও লাগতে পারে। এর চেয়ে যদি ঘুম কম হয়ে যায়, তাহলে তা দেহমন সবকিছুতেই প্রভাব ফেলে।

খাওয়াদাওয়া

পরীক্ষার সময় গুরুপাক কিছু খাওয়া বাদ দিন। সহজ ডাল-ভাতই যথেষ্ট। খাওয়া হজমের পেছনে শক্তি খরচ না করে মনের পেছনে দিন। আর ব্লাড প্রেশার বাড়ে এমন কিছু না খেয়ে বরং সুষম খাবার খান। আর অবশ্যই অবশ্যই প্রচুর পানি খাবেন, পানি খেতে বারবার উঠতে যাতে না হয়, সে জন্য পড়ার জায়গাতেই বোতল কিংবা জগে পানি রেখে দিন।

ব্যায়াম

পড়াশোনায় ভালো করতে হলে ব্যায়াম করতে হবে, এটা কি খুব বেখাপ্পা

শোনাচ্ছে? তা শোনালেও আসলে এটার দরকার আছে। দরকারটা কিন্তু ব্যায়ামবীর হওয়ার জন্য না। বরং নিজের স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য। পরীক্ষার হলে খুব অল্প সময় (দুই/তিন ঘণ্টায়) প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। সেটার জন্য যাতে শক্তি থাকে, নানাভাবে এর অভ্যাস করে নিতে হবে। লিখতে লিখতে হাত ব্যথা হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তার জন্য আসলে নিয়ম করে লেখার অভ্যাস করতে হবে, যাতে হাতটা খুলে যায়। আর সারাক্ষণ পড়ার টেবিলে না বসে থেকে একটু পর পর উঠে বসা, মিনিট কয়েক হাঁটাহাঁটি করা, এসব করে দেহটাকেও চালু রাখতে হবে। মোট কথা, কেবল বইয়ে মুখ গুঁজে থেকে দেহের বারোটা না বাজিয়ে শরীরটাকেও একটু নড়াচড়া করাতে হবে।

অনুশীলন

অনুশীলন হলো যেকোনো পরীক্ষায় ভালো করার সবচেয়ে বড় নিয়ামকগুলোর একটা। পরীক্ষা যেভাবে দেবেন, সেভাবে অনুশীলন করার অভ্যাস করতে হবে। যেমন— পরীক্ষা যদি মাল্টিপল চয়েজ কোশ্চেন হয়, তাহলে সেরকম নমুনা প্রশ্ন বা আগের বছরের প্রশ্ন নিয়মিতভাবে অনুশীলন করুন। আর সেটা করতে হবে ঘড়ির কাঁটা ধরে, মানে কত দ্রুত করতে পারছেন, তার হিসাব রেখে। আপনার লক্ষ্য হবে অনুশীলন করে করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্ন শেষ করা। যেমন— আপনার যদি এক ঘণ্টায় ৫০টি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, তাহলে মোটের ওপরে এক মিনিট ১২ সেকেন্ড সময় প্রতি প্রশ্নে। আপনার লক্ষ্য হবে চেষ্টা করে করে গড়ে এক মিনিটে যাতে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, তার চেষ্টা করা। প্রতিদিন অন্তত ১০টা প্রশ্ন হলেও অনুশীলন করুন, আর কতটা সময় লাগছে তা দেখুন।

পড়ার অগ্রগতির হিসাব রাখা

পুরো সিলেবাসের কতটা পড়া হলো, তার হিসাব কাগজে-কলমে (কিংবা কম্পিউটারে রাখুন)। সবচেয়ে ভালো হয় কাগজে লম্বা একটা লাইন টেনে তার তলায় সিলেবাসের নানা অংশ লিখে রাখা। তার পর যেসব জিনিস পড়া হয়ে গেছে, সেগুলো লাল রঙে বা মার্কার দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া। এ কাগজটা পড়ার টেবিলের সামনের দেয়ালে লাগিয়ে রাখলে হিসাবটা সব সময় মাথায় থাকবে।

বিনোদন

সারাক্ষণ পরীক্ষা পরীক্ষা করলে এবং অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে থাকলে এক সময়ে আপনার মাথার চুল অনেকটা আউটার স্টেডিয়ামের দিকে যাবে। কাজেই পরীক্ষার সময়ে মাঝে মাঝে নিজেকে পুরস্কার হিসেবে হলেও বিনোদনের জন্য কিছু করুন। সেটা হতে পারে টিভি দেখা, বই পড়া অথবা ইন্টারনেটে সময় কাটানো। তবে যা-ই করুন, সেটা মাত্রা বজায় রেখে করুন। সবচেয়ে ভালো হয় বিনোদনের জন্য আপনার রুটিনে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করে রাখা, যাতে করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে সময় না কাটান। পড়তে পড়তে বোরিং লাগবেই, সেই সময়টাতে মনটাকে সতেজ করতে হলেও বিনোদনের দরকার আছে অনেক।

মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

সব পরীক্ষা তো আর লিখিত না, অনেক পরীক্ষা আছে যা হলো ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন, তার সাথে মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ও তাতে ভালো করার অনেক বড় পার্থক্য আছে।

মৌখিক পরীক্ষার খুব বড় একটা বিষয় হলো আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আত্মবিশ্বাসী, নাকি নার্ভাস। আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে, যার মেধা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ ছিল না কখনোই, আর লিখিত পরীক্ষায় অনায়াসে সে পেটাত ছক্কা। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষাতে গেলেই বেচারা গুবলেট করে ফেলত, ফলে যেসব জায়গায় ভাইভার ব্যাপার ছিল, তার সবখানেই এই বেচারার হতো সর্বনাশ। এর কারণ হিসেবে আমি যা বুঝেছি তা হলো আমার এই বন্ধুকে দেখেই বোঝা যেত সে প্রচণ্ড নার্ভাস, তাই তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এক নজর দেখেই পরীক্ষকেরা তার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা করে নিতেন।

তাহলে ভাইভা পরীক্ষায় ভালো করবেন কীভাবে? আসুন, দেখা যাক কিছু পরামর্শ—

আত্মবিশ্বাস : মৌখিক পরীক্ষায় আসলে আপনি বিষয়টি জানেন কি না, তা ছাড়াও দেখা হয় আপনার আত্মবিশ্বাস কতটুকু। তাই নিজেকে কতটা আত্মবিশ্বাসী দেখায়, তা একটু খেয়াল রাখুন। আয়নায় নিজেকে দেখুন, মনে মনে ভাবুন আপনি পরীক্ষার হলে, সামনে একাধিক পরীক্ষক টেবিলে বসে আছেন। এ অবস্থায় আপনার চেহারাটা কেমন হয়ে যায়? দরকার হলে বন্ধু বা পরিবারের কাউকে প্রশ্নকর্তা ভেবে নিয়ে তাকে দেখতে বলুন আপনাকে কেমন আত্মবিশ্বাসী দেখায়। অথবা মোবাইল ফোনে ভিডিও

রেকর্ড করে রাখুন। আপনার চেহারায় যদি আত্মবিশ্বাসের ছাপ না থাকে, তাহলে ভাইভা পরীক্ষায় আপনি অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস কি গাছে ধরে? নাহ্, এটা চর্চার বিষয়। অন্তত চেহারায় আত্মবিশ্বাসী ভাবটা নিয়ে আসাটা অনুশীলন করুন। হাসি হাসি চেহারা (কিন্তু অট্টহাসি না) করা ভালো। আপনার পিঠটাও সোজা করে দাঁড়ান।

পোশাক-আশাক : পরীক্ষার হলে পরিপাটি হয়ে যাবেন। এর মানে কিন্তু এই না যে তেল চপচপে গুডি গুডি বয় বা গার্ল সেজে যেতে হবে। বরং পরিচ্ছন্নভাবে এবং গুছিয়ে থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। ক্যাটক্যাটে মার্কা রঙের পোশাক না পরে নিউট্রাল রং, যেমন সাদা বা ধূসর বা এরকম সহনীয় রঙের কাপড় পরুন। আপনার লক্ষ্য হলো আপনাকে দেখেই যাতে বিরক্ত না হয় কেউ, তা নিশ্চিত করা।

মেপে কথা বলা : ভাইভা বোর্ডে অতিরিক্ত কথা বলতে গেলে নিজেই বিপদে পড়বেন। ভাইভাতে কাউকে আটকানোর একটা খুব সহজ কায়দা হলো সে যে উত্তর দিয়েছে, তার মধ্য থেকেই পেঁচিয়ে ধরে পরের প্রশ্নটি করা। তাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ : বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো আমাদের অবচেতনভাবে দেহের নানা অংশের ভঙ্গি কিংবা নড়াচড়া অন্যদের কাছে কেমন ঠেকছে, তারই অপর নাম। আসলে মুখে না বললেও কাউকে দেখে যদি ভেতরের সব খবর বুঝে ফেলা যায়, তার কারণ হলো মূলত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাইভা পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো খুব পজিটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রাখা। সোজা করে বসা ছাড়াও হাত-পায়ের অযথা নড়াচড়া হচ্ছে কি না, তা খেয়াল করুন। অনেকে নার্ভাস হয়ে পা নাচাতে থাকে, যা আসলে খুবই বিরক্তিকর। আবার অনেকে ভয়ে কুলুকুলু করে থাকে ঘামতে। যাতে না ঘামেন, সেই ব্যবস্থা করুন (দরকার হলে অ্যান্টি পার্স্পিরেন্ট দিয়ে)। কথা বলার সময়ে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিন। আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন তা বোঝার জন্য আয়নার সামনে প্রশ্নের জবাব দিয়ে অনুশীলন করুন, অথবা দরকার হলে কাউকে ফোনে রেকর্ড করে দেখাতে বলেন। আর নিজে না বুঝলেও অন্যকে জিজ্ঞেস করেন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময়ে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন হয়, দেখে কি মনে হয় আপনি খুব নার্ভাস?

ভাইভা পরীক্ষায় ভালো করাটা আসলে ভাগ্যের ব্যাপার না কেবল। আপনি মানুষের সাথে কথা বলায় কতটা দক্ষ, চেহারাতে কতটা আত্মবিশ্বাসী, সেটা এখানে অনেক বড় একটা ব্যাপার। অনুশীলন করলে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স ভালো করা সম্ভব।

পরীক্ষা প্রস্তুতির পাঁচ দিনের পরিকল্পনা

পরীক্ষার ঠিক আগে বা দুই পরীক্ষার ব্যবধান যদি কয়েক দিন হয়, তাহলে কীভাবে পড়লে পরীক্ষার দিনে সবচেয়ে ভালো করে মনে রাখতে পারবেন? এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব কী করে অল্প সময়ে এবং পরীক্ষার ঠিক আগে আগে ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

দুই পরীক্ষার মাঝের ব্যবধান সাধারণত দুই-তিন থেকে পাঁচ-ছয় দিন হতে পারে। কাজেই আপনি সময়টা আসলে খুবই কম পাচ্ছেন। আপনার লক্ষ্য হবে এই অল্প সময়ে কীভাবে সিলেবাসের বিষয়গুলোকে ভালো করে পড়ে ফেলা যায় এবং এমনভাবে পড়া হয় যাতে পরীক্ষার দিন আপনার সব মনে থাকে।

এই মনে করতে পারাটাই এখানে মুখ্য। খেয়াল করে দেখুন, এক মাস কিংবা এক সপ্তাহ আগে খুব ভালো করেও যদি কিছু পড়ে থাকেন, তার বিস্তারিত সবকিছু কি আপনার মনে আছে? সম্ভবত না, তাই না? কিন্তু এক দিন আগে যা পড়েছেন বা রিভিউ দিয়েছেন, তা তো মনে থাকবে ভালোই, তাই না?

ধরা যাক, আপনার দুই পরীক্ষার আগের ব্যবধান হলো পাঁচ দিন। পুরো সিলেবাস আগেই আপনি শেষ করেছেন, তাই পরীক্ষার আগে রিভিশন দিতে পারবেন। কিন্তু পরীক্ষার পাঁচ দিন আগে যদি কিছু পড়েন, পরীক্ষার দিনে সেটা খুব ভালো করে মনে থাকার সম্ভাবনা যাচ্ছে কমে।

তাহলে উপায়?

আপনাকে হতে হবে কৌশলী। পড়ার জন্য এমন একটা ধারায় পড়তে হবে, যাতে পড়া আর রিভিশন সব একসাথে চলবে, আর পুরো পাঁচ দিনই আপনি কাজে লাগাবেন। রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের পরামর্শ

সেরকমই, তাদের দেওয়া পাঁচ দিনের প্রস্তুতি পরিকল্পনাটা অনেকটা এরকম।

প্রথম ধাপ : পরীক্ষার সিলেবাসটাকে চার ভাগে ভাগ করুন।

দ্বিতীয় ধাপ : দৈনিক পড়ার ধারাটা এভাবে নির্ধারণ করুন -

প্রথম দিন : সিলেবাসের প্রথম অংশ পড়বেন। পড়ার সময়ে প্রতিটি চ্যাপ্টারের ওপরে আপনার নোট, মূল বই, ক্লাসনোট এসব পড়বেন। পরে রিভিশন দিতে সুবিধা হয় যাতে, সে জন্য কঠিন অংশগুলোকে দাগিয়ে রাখবেন, পরে রিভিশনের সময়ে সেসব জায়গায় বেশি জোর দিতে হবে।

দ্বিতীয় দিন : সিলেবাসের দ্বিতীয় অংশ পড়বেন এবং প্রথম অংশকে রিভিশন দেওয়ার জন্য ঘণ্টা খানেক সময় রাখবেন।

তৃতীয় দিন : সিলেবাসের তৃতীয় অংশ পড়বেন এবং প্রথম অংশকে রিভিশন দেবেন ৪৫ মিনিট সময়ে, দ্বিতীয় অংশকে রিভিশন দেবেন এক ঘণ্টা সময়ে।

চতুর্থ দিন : সিলেবাসের চতুর্থ অংশটি পড়বেন এবং প্রথম অংশকে ৩০ মিনিট, দ্বিতীয় অংশকে ৪৫ মিনিট এবং তৃতীয় অংশকে এক ঘণ্টা সময়ে রিভিশন করবেন।

পঞ্চম দিন : এটা হবে রিভিশন দিবস। সিলেবাসের সব অংশকে এক ঘণ্টা করে করে রিভিশন করবেন। প্র্যাকটিস টেস্ট দিতে পারলে আরও ভালো।

এভাবে পড়ার সুবিধাটা হলো পরীক্ষার সিলেবাসের সবকিছুই আপনি পড়ছেন আর রিভিউ করছেন পরীক্ষার ঠিক আগের দিন পর্যন্ত; যা পড়ছেন, প্রতিদিন রিভিশন দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখছেন, সে জন্য সিলেবাসের প্রথম অংশকে আগে পড়লেও প্রতিদিন রিভিশন দিয়ে দিয়ে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারছেন।

পরীক্ষা প্রস্তুতির এক দিনের পরিকল্পনা

আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম পরীক্ষার পাঁচ দিন বা এর কাছাকাছি বাকি থাকলে কীভাবে পড়বেন। কিন্তু ধরুন আপনার পরীক্ষার আগে বা দুই পরীক্ষার মাঝে গ্যাপ খুবই কম, মাত্র এক দিন বা তারও কম। সে ক্ষেত্রে কীভাবে পড়বেন?

খুব অল্প সময়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে আসলে আপনাকে হতে হবে খুব কৌশলী। মোটামুটি সেমিস্টারের মাঝামাঝি সময় থেকেই পরীক্ষার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করুন। পরীক্ষার আগের দিনের জন্য একটা আলাদা নোটবুক বা ফাইল তৈরি করে রাখুন। খুব দরকারি সব বিষয় সেখানে থাকবে, যা পরীক্ষার আগের দিনের অল্প সময়ে আপনি দেখবেন।

মনে রাখবেন, পরীক্ষার আগের খুব অল্প সময়ে আপনি কিন্তু পুরো বইটা বা পুরো সিলেবাস রিভিশন দিতে পারবেন না। সেটা করতে গেলে বা পাগলের মতো সবকিছুই দেখতে গেলে আপনার মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হবে। তাই পরীক্ষার আগের দিনের পড়ার জন্য কেবল গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুর তালিকা করুন। দরকার হলে নোট বা বইয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ ফটোকপি করে এই পরীক্ষা ফাইলে রাখুন। তার পাশাপাশি অন্য সবকিছু যেমন পরীক্ষার নানা সূত্র, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সংক্ষেপে এখানে লিখে রাখুন।

পড়বেন কীভাবে?

পরীক্ষার আগে যদি এক দিন সময় থাকে, তাহলে আপনার হাতে খুব অল্প কিছু ঘণ্টা আছে। তাই সুচিন্তিতভাবে এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে। আমি নিজে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতাম তা অনেকটা এরকম—

১. শুরুতেই সিলেবাসটা একবার দেখে নিতে হবে। কোনো কিছু কতটা পড়া আছে বা কিছু আদৌ পড়েননি, তা দেখে নিন।

২. এবার আপনার পরীক্ষা ফাইল থেকে গুরুত্বপূর্ণ যা যা পড়ার তালিকা করেছিলেন, সেগুলো অবশ্যই পড়ে নিন।

৩. এটা হয়ে গেলে যদি হাতে সময় থাকে, তাহলে বাকি যা আছে, তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

৪. দরকার হলে হাত খোলার জন্য পরীক্ষার ওপরে পুরোনো প্রশ্ন থেকে একটা-দুইটা প্রশ্ন লিখে দেখুন। সময় কেমন লাগছে তা দেখে নিন।

৫. এবার পুরোনো কয়েক বছরের প্রশ্ন হাতে নিয়ে বসুন। সলভ করতে হবে না; বরং প্রশ্ন দেখুন আর চিন্তা করুন এই প্রশ্নটা আপনি পারবেন কি না বা এই প্রশ্নের জবাব কেমন হবে।

মোটামুটিভাবে ১ থেকে ৪ নম্বরের পেছনে সাত-আট ঘণ্টা দিয়ে ৫ নম্বর পরামর্শের ওপরে অন্তত ঘণ্টা খানেক সময় বরাদ্দ রাখুন।

অল্প সময়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হলে আসলে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির দরকার আছে, কাজেই রাতারাতি আকাশ থেকে না পড়ে অনেক আগে থেকেই কাজটা করে রাখুন, পরীক্ষার আগের দিন তাহলে আর পাগল পাগল লাগবে না মোটেই।

পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

পরীক্ষার আগের রাতে কী করবেন?

আগে বলি কী করবেন না। সারা রাত পড়ে ফাটিয়ে ফেলার প্ল্যান করবেন না আদৌ। বুয়েটে আমার পাশের রুমের এক ছেলে একবার রাতে বিশাল ফাইট দেওয়ার পরিকল্পনা করল। করলও। কিন্তু ফলাফল? পরীক্ষা সকাল নয়টা থেকে, আর ঘুম ভাঙল তার বেলা একটার দিকে। এটা চরম উদাহরণ হলেও আসল কথা হলো, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মগজকে যেমন সতেজ হতে হয়, তার অধিকাংশটাই নষ্ট হয়ে যায় সারা রাত পড়াশোনা করলে।

আচ্ছা, সারা রাত না হয় না-ই পড়লেন, সারা সন্ধ্যা? আসলে সারা সন্ধ্যা পরীক্ষার পড়ার জাবর না কেটে বরং পরীক্ষার সকালের কাজটা কমান, কলম, কাগজপত্র, আইডি, কাপড়চোপড়, মানিব্যাগ এসব গুছিয়ে রাখুন। সেটা সবার আগে। আর তা হয়ে গেলে রিভিশন করুন। নতুন কিছু পড়তে যাবেন না; বরং আগে যা পড়েছেন, তা-ই রিভিশন দিন। খুব ভালো হয় যদি কোনো সহপাঠীর সাথে এটা করতে পারেন। একজন পড়া বলবে আরেকজন শুনবে, এরকম। আর যদি বন্ধুবান্ধব কাছে না থাকে, ফোনেও এটা করতে পারেন, না হলে একাই নিজের ফোনে রেকর্ড করে পড়া শোনান।

আর পরীক্ষার আগের রাতের খাওয়া-দাওয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারী বদহজম হয় এরকম কিছু না খাওয়াই ভালো, আর এর পাশাপাশি বিশাল পেট পুরে না খাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ। বেশি করে পানি খান, পানির অভাবটা মানুষ সহজে টের পায় না, কিন্তু সেটা দেহ-মন সবটাকেই দুর্বল করে দেয় অজান্তেই।

সবচেয়ে বড় যা দরকার তা হলো নিজের ওপরে বিশ্বাস। মনে রাখবেন, পরীক্ষা খারাপ হলে কিন্তু আপনি মারা যাবেন না। অন্য যা-ই হোক না কেন, সেটা শুধরে নেওয়া চলে, আজ হোক, কাল। তাই পরীক্ষার ভয়টাকে পাঠান দূরে কোথাও নির্বাসনে। বুক ভরে শ্বাস নিন, পরীক্ষার কথা দূর করে দিন মাথা থেকে বহু বহু দূরে।

পরীক্ষার দিন

পরীক্ষার দিনে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন? পরীক্ষার দিনে দিশেহারা হয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটা খুবই স্বাভাবিক। অল্প কিছু জিনিস খেয়াল করলেই কিন্তু নানা ঝুঁকি এড়ানো যাবে। আসুন, দেখা যাক—

সময় নিয়ে যাওয়া

এখনো মনে আছে, স্কুলের এক পরীক্ষার কথা। পরীক্ষা দিয়ে ফিরছি দুপুরে। ফেরার পথে দেখা হলো প্রতিবেশী এক বন্ধুর সাথে। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম কেমন পরীক্ষা হয়েছে। আঁতকে উঠে সে বলল, পরীক্ষা আজকে বিকালে না?? বেচারা পরীক্ষার সময়টা গুলিয়ে ফেলাতে সেই পরীক্ষাটাই মিস করে ফেলেছিল।

এ ঘটনা কমবেশি যে কারোরই ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। কাজেই অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, পরীক্ষার দিন, স্থান ও সময়টা। পরীক্ষার রুটিন দিলে প্রথমেই ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, কবে কখন পরীক্ষা। ক্যালেন্ডারে বড় করে সেটা লিখে রাখুন। পরীক্ষার হল যদি অচেনা হয়, তাহলে সেখানে আগেই একবার গিয়ে দেখুন, যেতে কতক্ষণ লাগে, কোন রুমে পরীক্ষা। প্রতি পরীক্ষার পরে পরবর্তী পরীক্ষার তথ্য ঠিকমতো জানেন কি না, তা যাচাই করে দেখুন বন্ধুদের সাথে কথা বলে। আর পরীক্ষার দিন যথেষ্ট সময় নিয়ে, জ্যাম/রাস্তা বন্ধ সবকিছু হিসাবে রেখে আগে থেকে যাত্রা শুরু করুন।

খাতা-কলম প্রবেশপত্রের চেকলিস্ট

পরীক্ষার হলে কী নিয়ে যাবেন? এগুলো নিয়ে আন্দাজে থাকার দরকার নাই। পরীক্ষার দিন সকালে হাতড়াহাতড়ি না করে আগে থেকেই তালিকা বা চেকলিস্ট করে রাখুন। বেরোনোর আগে চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে

দেখুন— প্রবেশপত্র, কলম, ক্যালকুলেটর সবকিছু ঠিকমতো সাথে আছে কি না। কলম কাজ করছে কি না।

প্রশ্ন পড়া

পরীক্ষার হলে গিয়ে আপনার জায়গাটা শুরুতেই গুছিয়ে নিন। কলম-ক্যালকুলেটর থেকে শুরু করে সবকিছু জায়গামতো রেখে দিন। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পরে সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। প্রথম এক মিনিট বরাদ্দ করেন প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে। অনেক সময়ে তাড়াহুড়ার কারণে প্রশ্নের অপর পৃষ্ঠা অথবা কোনো প্রশ্ন বাধ্যতামূলক কি না, তা অনেকে খেয়াল করেন না। কাজেই শুরুতে ভালো করে প্রশ্নটা পড়ে নিন। কী কী প্রশ্ন ভালো জানেন, সেটা বিচার করে দাগিয়ে নিন যে সেগুলোর জবাব দেবেন।

লেখা শুরু

ফার্স্ট ইম্প্রেশন বলে কথা আছে। পরীক্ষার শুরুতেই তাই সবচেয়ে ভালো করে জানেন, এমন প্রশ্নের জবাব দিন। সবচেয়ে ভালো করে যা যা জানেন, শুরুর দিকে সেগুলো লেখা হলে তবেই পরে কঠিন প্রশ্নের জবাব দিন।

ঘড়ি দেখা

পরীক্ষার মধ্যে সময়ের দিকে খেয়াল রাখা খুব দরকার। তাই ঘড়িটা টেবিলের ওপরে রাখুন। ডিজিটাল ঘড়ি হলে ভালো হয়, যাতে করে সময়টা দ্রুত দেখে নিতে পারেন। প্রতি প্রশ্নের জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ করছেন এবং সেটা আসলেই ঠিক রাখতে পারছেন কি না, সেটা খেয়াল রাখুন।

পরীক্ষার শেষে

পরীক্ষার শেষে প্রথমেই যেটা করবেন তা হলো প্রশ্নটাকে ভাঁজ করে পকেটে বা ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলুন। তারপর দ্রুত পরীক্ষার হল থেকে কেটে পড়ুন। অনেকের অভ্যাস থাকে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সাথে উত্তর মেলানোর। কিন্তু ভেবে দেখুন, এতে করে কি আসলে কোনো লাভ হয়? আপনি ভুল করেছেন, নাকি ঠিক লিখেছেন, তা জেনে কী হবে? আপনার পরীক্ষার ফলাফল তো আর পাল্টাবে না, তাই না? কাজেই এটা করে মন খারাপ করার কোনোই দরকার নাই। আর 'পরীক্ষা কেমন দিলি' এই টাইপের প্রশ্নের একটা জবাব ঠিক করে রাখুন, সেটাই বলেন।

এবং অন্যদের এই প্রশ্ন করা বাদ দিন। অন্যেরা কেমন দিল, তা দিয়ে আপনার কী যায়-আসবে, তাই না?

পরীক্ষার চেকলিস্ট	
পরীক্ষার বিষয় :	
স্থান :	
যেতে কতক্ষণ লাগে :	
তারিখ :	
শুরুর সময় :	
শেষের সময় :	
হলে যা যা নিচ্ছেন :	

‘দেখায়া দিব’ সিনড্রোম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

‘আগামী সেমিস্টারেই দেখায়া দিমু।’

কথাটা কি চেনা চেনা লাগে? অধিকাংশ মানুষ কোনো না-কোনো সময়ে এ কথাটা বলেছেন কিংবা চিন্তা করেছেন। আপনি নিজেও বলেছেন, তাই না?

কথাটা বলায় কোনো সমস্যা নাই। অবশ্যই আপনি আশা করতে পারেন যে, এবারে তো হলো না, আগামীবারেই দেখিয়ে দেবেন।

সমস্যাটা অন্য জায়গায়।

সমস্যাটা হলো আপনি এ কথাটা মনে রাখছেন কি না।

অধিকাংশ মানুষ যারা এ কথাটা বলেন, তারা বলাতেই খ্যামা দেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই কথাটা ভুলে যান এবং পরের সেমিস্টার তো অনেক পরের কথা, পরের মিনিটেই এই সংকল্পের কথা যান পুরোপুরি ভুলে।

কিন্তু তাতে সমস্যা আছে কি?

আছে বৈ কি।

জিদ অনেক বড় একটা ব্যাপার। জিদের বশে মানুষ না পারার মতো অনেক কাজও করে বসতে পারে। এবং তা করার জন্য মহামানব হওয়া লাগে না, সাধারণ মানুষই জিদের বশে অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে।

এ ব্যাপারটাকে কাজে লাগান পড়াশোনার ক্ষেত্রে।

প্রতিজ্ঞা করুন, ‘দেখায়া দিব’ এ কথাটা যখন বলবেন, তখনই কথাটা লিখেও ফেলবেন একটা কাগজে, বড় বড় করে।

তার পর আপনার পড়ার টেবিলে বা বিছানার সামনে দেয়ালে লাগিয়ে রাখবেন, যাতে করে প্রতি দিন চোখে পড়ে, মনে থাকে আপনার এই সংকল্প।

আর কী 'দেখায়া দেবেন', সেটাও চিন্তা করে নিন এই ফাঁকে। আপনি ঠিক কী পেতে চান পরের বারে, তা লিখে ফেলুন খাতা-কলমে। বর্তমান অবস্থা যদি পয়েন্ট এ হয়, আর আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল যদি হয় পয়েন্ট বি, এ থেকে বি-তে যেতে হলে কী কী করতে হবে, তার তালিকা বানান।

এবং আগামী কাল কিংবা আগামী সেমিস্টারে ঠিক সে কাজগুলোই করতে থাকুন।

জিদ ভালো জিনিস। জিদ কাজে লাগান। আসলেই 'দেখায়া দিন'। সবাইকে এবং সবার ওপরে, নিজেকেই।

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে কী করবেন

খুব কমন একটা ব্যাপারের কথা দিয়ে এই অনুচ্ছেদটা শুরু করি। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সবাই কী করে, তা একটু মনে করে দেখুন।

'দোস্ত, ৫ নম্বর অঙ্কের উত্তর কত, ৭.৩ নাকি?'

'কেমন দিলি পরীক্ষা?'

'ভালো হয় নাই, খুব খারাপ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন ঠান্ডা মাথায় একটা কথা ভাবেন। পরীক্ষা তো দিয়েই ফেলেছেন, তাই না? তাহলে এই যে বেরিয়ে উত্তর মেলানোর পালা, তাতে কি আপনার পরীক্ষার ফলে কিছু যায়-আসবে? মানে আপনি উত্তর মিলিয়ে দেখলেন আপনার উত্তর ভুল, তাতে কি কিছু পাল্টাবে? অথবা দেখলেন উত্তর ঠিক, তাতে কি দুই এক নম্বর বেশি পাবেন?

আপনার বন্ধু ভালো দিয়েছে না খারাপ দিয়েছে, অন্যেরা কত ছেড়েছে, কত লিখেছে, এসবে কি কিছু যায়-আসে?

তাহলে আমরা এসব করি কেন?

কারণ আমরা কেমন করেছি, তার তাৎক্ষণিক ফলাফল জানতে চাই, আর অন্যরা কেমন করেছে তা জানতে চাই আমরা আসলে খুব প্রতিযোগিতামূলক বলে।

কিন্তু এতে করে কী ফলাফল হয়?

নম্বর বা পরীক্ষার ফল কিছু পরিবর্তন হবে না, তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু একটা বড় প্রভাব আছে বটে এরকম কথাবার্তার। তা হলো আপনার পরের পরীক্ষার ওপর অথবা আপনার মানসিক অবস্থার ওপরে। আপনি যদি বন্ধুদের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারেন আপনার উত্তর ভুল হয়েছে বা অন্যরা আপনার চেয়ে ভালো পরীক্ষা দিয়েছে, তাহলে আপনার

স্বভাবতই মন খারাপ হবে, আর এই মন খারাপ ডেকে নিয়ে আসবে হতাশা, যা আপনার পরের পরীক্ষায় প্রভাব ফেলবে। আর অন্যদের যখন প্রশ্ন করেন কেমন হয়েছে তাদের, জবাব শুনে হয়তো নিজেই ভাববেন সবাই ভালো দিয়েছে আর কেবল আপনিই খারাপ দিয়েছেন। বাস্তবে হয়তো আপনার বন্ধুর পরীক্ষা আপনার চেয়ে মোটেও ভালো হয়নি, কিন্তু তার পরেও আপনি সেটা ভেবে ধরে বসে থাকবেন, আর বাড়াবেন হতাশা।

তাহলে পরীক্ষার হল থেকে বেরোনোর পরে কী করবেন?

খুব সোজা!

হাসিমুখে বেরোবেন। কেউ উত্তর মেলাতে এলে বলবেন তাকে রাস্তা মাপতে (ভদ্র ভাষায়), আর কেউ পরীক্ষা কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলবেন 'ভালোই।' ব্যস, এটুকু বলে দ্রুত কেটে পড়ুন। পরের পরীক্ষাটার প্রস্তুতি নিতে হবে না?

এরকম করলে অনেক মানসিক বেদনা থেকে পাবেন মুক্তি, আর পরের পরীক্ষার দিকে করতে পারবেন মনোনিবেশ। একই কারণে পরীক্ষা দিয়ে এসে সেই পরীক্ষার বইখাতা খুলে উত্তর ঠিক দিয়েছেন কি না, তা চিন্তা করে বের করার চেষ্টাও বাদ দিন। কবির ভাষায়, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' গতস্য শোচনা নাস্তি— তাই পরীক্ষায় কী করেছেন তার চর্বিত চর্বণ বাদ দিয়ে পরের পরীক্ষার দিকে দিন মন।

ছুটির সময়কে কাজে মোক্ষমভাবে লাগানো

পরীক্ষা শেষ হয়েছে? শুরুতেই ইয়াহু! বলে বিশাল একটা লাফ দিয়ে নিন। বিশাল একটা ফাঁড়া কেটেছে তাই না?

কিন্তু এখন? কী করবেন এখন, পরের সেমিস্টার যদি শুরু হয় মাস খানেক পরে?

প্রথমেই আপনার কাজ হবে মনের সুখ মিটিয়ে ঘোরাঘুরি করে নেওয়া, যে কাজটা সেমিস্টার চলাকালে করতে পারবেন না। অথবা সিনেমা দেখা, নানা রকমের প্রোগ্রাম করা, অথবা কেবল পড়ে পড়ে কয়েক দিন ঘুমানো। পরীক্ষার ধকলটা মোটামুটি সামলে উঠলে অল্প কয়েকটা কাজ করে নিন।

দিন-তারিখের হিসাব : আগামী সেমিস্টার কবে শুরু হবে? তার আগে কি কোনো কিছু কাজ অফিসে করতে হবে? রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে অন্যান্য অফিশিয়াল কাজ কী কী করতে হবে? এই ব্যাপারগুলোর তালিকা করে নিন খাতা-কলমে। আর বন্ধুদের সাথে কিংবা আপনার স্কুল-কলেজের অফিসে সে কাজগুলোর তালিকা যাচাই করে নিন।

কী কী লাগবে : পরের সেমিস্টারে কিংবা বছরে কী কী বইপত্র কেনা লাগতে পারে, তা জেনে নিন। অনেক কিছুই অন্যদের কাছ থেকে অল্প খরচে সেকেন্ড হ্যান্ড জোগাড় করতে পারবেন, তা করে ফেলুন। এর সাথে সাথে আগে থেকেই খবর নিয়ে নিন কী কী আনুষঙ্গিক জিনিস লাগবে।

লক্ষ্য স্থির করা : আগামী সেমিস্টার কিংবা বছরে আপনি আসলে কী করতে চান? প্রশ্নটা নিজেকে করুন। মানে আপনি আগামীবারে কী ফলাফল করতে চান, সেটা নিয়ে ভাবুন। আপনি কি জিপিএ বাড়াতে চান? অথবা অমুক বিষয়টা ভালো করে শিখতে চান? নাকি তমুক পরীক্ষায় পাস করতে চান?

আপনার লক্ষ্য যা-ই হোক, সেটা লিখে ফেলুন, লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে, তাহলে আপনার করণীয় কাজটা সহজে বুঝতে পারবেন না। কাজেই খাতা-কলম নিয়ে লিখে ফেলুন, 'আগামীতে (সেমিস্টার/বছরে) আমি যা করতে চাই তা হলো...।

একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া : ছুটির সময়টার শেষদিকে হালকা করে পরের সেমিস্টারের সিলেবাসটা চোখ বুলিয়ে নিন। খুব বেশি পড়াশোনা আগেভাগে করে রাখার দরকার নাই; বরং মোটামুটি পরের সেমিস্টারে কোনটা বেশি কঠিন আর কোনটা সহজ বিষয়, তা আন্দাজ করে নিন। দরকার হলে দুই-একজন সহপাঠী একসাথে বসে এটা দেখতে পারেন। এর সাথে সাথে যা করবেন তা হলো পরিকল্পনা করে রাখা। পরের সেমিস্টার বা বছরে যা যা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল লাগতে পারে, তার সম্ভাব্য তালিকা করে রাখা।

পড়ার আনুষঙ্গিক বিষয়

পড়ালেখা ও পার্টটাইম কাজ বা টিউশনি একসাথে চালানো

পড়ালেখা করার সময়ে পার্টটাইম কাজ বা টিউশনি একসাথে চালানোর দরকার হতে পারে নানা কারণেই। অনেক শিক্ষার্থীকে নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে হয়। অনেকে আবার হাতখরচ জোগানোর জন্য কিংবা শখের জিনিস কেনার জন্য কাজ করে থাকেন। বিদেশে এটা খুবই স্বাভাবিক হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ ব্যাপারটা অনেক সময়েই পড়ার জন্য নেতিবাচক, এমন ভুল ধারণা আছে।

ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই। আমি নিজে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে দ্বিতীয় বর্ষ থেকে নিজের সব খরচ নিজের উপার্জনেই চালিয়েছি। সেই সময়টাতে ফ্রিল্যান্সিং বা এরকম কাজের সুযোগ কম ছিল। আমি প্রচুর মানুষকে প্রোগ্রামিং শিখিয়েছি, এমনকি অনেক সময় একই দিনে তিন-চার ব্যাচ ছাত্রও পড়িয়েছি। কিন্তু এতে আমার একাডেমিক পড়াশোনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। এর কারণ হলো পড়ালেখার পাশাপাশি এরকম পার্টটাইম টিউশনি বা অন্য কাজ বুঝেশুনে করলে পড়ার কোনো ক্ষতি না করেই করা যায়। অনেকেই টিউশনির বা কাজের কারণে পড়ার বারোটা বাজান, তার মূল কারণ হলো মাত্রাজ্ঞান না থাকা এবং সময় ব্যবস্থাপনার সমস্যা। আসুন, দেখা যাক, কীভাবে পড়ালেখার সমস্যা না করেও পার্টটাইম উপার্জনের কাজটা দরকার হলে চালিয়ে নেওয়া যায়, এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ।

সময় : আপনার হাতে দিনে বড়জোর ১৬ ঘণ্টা থাকে ঘুম, খাওয়া ও অন্যান্য কাজ বাদ দিলে। এর মাঝে ক্লাসের জন্য হয়তো যাচ্ছে দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা। বাকি কতটুকু থাকে? বড়জোর আট ঘণ্টা? এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, দিনে কয় ঘণ্টা সময় আপনি কাজে দিতে পারবেন। এর মাঝে অবশ্যই যাতায়াতের সময়টা হিসাবে ধরতে হবে। আর তার সাথে সাথে ধরতে হবে আপনি ক্লাসের পড়ার বাসায় এসে পড়া/পরীক্ষার

প্রস্তুতি এসবের কাজটার জন্য দিনে কয় ঘণ্টা বরাদ্দ রাখছেন। এই হিসাবটা সবার আগে করুন, আর তার পরে সিদ্ধান্ত নিন আসলেই আপনি সময় পাবেন কি না।

অগ্রাধিকার : আপনার কাছে অগ্রাধিকার কোনটা পাবে, কাজ, নাকি পড়া? কাজ থেকে অর্থ উপার্জন হবে বটে, কিন্তু তার কী রকম প্রভাব আপনার পড়াশোনায় পড়বে?

আপনি কী শিখছেন? : পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতে হলে এমন কাজ বেছে নেওয়া উচিত, যার মাধ্যমে আপনার নিজেরও উপকার হবে। টাকাটা বড় কথা না, বরং অন্যান্য বিষয়ের দিকেও নজর দিন। যেমন, টিউশনির বিষয়টি পড়িয়ে আপনার নিজের কি কনসেপ্ট পরিষ্কার হচ্ছে? অথবা যে কাজটি করছেন, তা আপনার ক্যারিয়ারে কী কাজে দেবে, এ কাজটি আপনার রেজুউমিতে কি আপনি লিখতে পারবেন, কাজের অভিজ্ঞতা হিসেবে? যেমন ধরুন পার্টটাইম প্রোগ্রামার হিসেবে যদি কাজ করেন, তাহলে কিন্তু এই কাজের অভিজ্ঞতাটা আপনার রেজিউমিতে যোগ করে পরবর্তী সময়ে কাজে লাগাতে পারবেন। কিন্তু টিউশনির কথাটা আসলে ঠিক সেভাবে কোথাও লিখতে পারবেন না।

টাকাটা মুখ্য না, সময় ও পড়ালেখাই মুখ্য : আমার পরিচিত অনেক মেধাবী ছাত্র এক সময় টাকার নেশায় মত্ত হয়ে সীমা রাখতে পারেনি। একজনের কথা জানতাম যে একই সাথে ১০টি টিউশনি করাত। ক্লাসের তোয়াক্কা না করে সে প্রায় সারা দিনই টিউশনিতে ঘুরত। এর ফলে ছাত্রাবস্থায় মোটরসাইকেল কেনার টাকা তার হয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তার পড়ার বেজেছিল বারোটা। এ ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই, আপনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজের পড়াশোনা— অর্থ উপার্জন নয়। কাজেই পড়ালেখায় কোনো প্রভাব যাতে না পড়ে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন এবং আপনার আসল লক্ষ্য যে পড়াশোনাই, তা নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিন।

ছুটির সময়টা কাজে লাগান : আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সময়টা সেমিস্টার বা ইয়ার ব্রেক কিংবা গ্রীষ্মের ছুটি থাকে, সেই সময়টাকে কাজে লাগান। মাস খানেকের জন্য দরকার হলে বেশি সময় দিয়ে কাজ করে নিন, যাতে করে ক্লাস চলার সময়ে পড়াতেই মন দিতে পারেন।

আলসেমি হতে বাঁচবেন কীভাবে?

আলসেমি। সময়ের কাজ সময়ে না করে বসে থাকা, আর ডেডলাইনের আগে সারারাত জেগে থেকে কাজ করে বেড়ানো। আলসেমি আসলে আমাদের সবার মজ্জাগত একটা অভ্যাস। আলসেমির কারণেই মনে হয় অনেক তো সময় আছে, পরে করলেও চলবে। কিন্তু যখন শেষমেশ কাজটা করতে যান, তখন দেখতে পান সময় তো আর বেশি নাই, যা সময় আছে, তাতে এ কাজটা ঠিকমতো করা হবে না।

আলসেমির কুফল

আলসেমির কুফল ব্যাখ্যা করে বলার কিছুই নাই। পড়ালেখার ক্ষেত্রে যেটা হয় তাই না হয় বলি— আলসেমি করে পড়াটা শেষ সময়ের জন্য রেখে দিলে ভালো করে পড়া হয় না। আপনি যে রিপোর্ট বা কাজটা করতে পারতেন, সেই মানের কাজ হয় না। তাড়াহুড়ায় অজস্র ভুল জমে যায় কাজের মাঝে, পড়াশোনা ঠিকমতো করে হয় না। আর যদি হয়েও থাকে, তা শেষ সময়ে আপনার অতিমানবীয় পরিশ্রমের ফলাফল। আলসেমিটা না করে কাজটা সময়মতো করলে কিন্তু কাজের মানও বাড়ত, আর আপনার রাত জেগে থেকে কাজ করার দরকারটাও হতো না।

আলসেমি থেকে বাঁচবেন কীভাবে?

আগে ভেবে দেখুন, আলসেমির কারণটা কী? প্রথমত, আপনি ভেবে নিচ্ছেন যে হাতে অনেক সময় আছে, অর্থাৎ আসল কাজটি করতে (পড়াশোনা, রিপোর্ট লেখা ইত্যাদি) আপনার কত সময় লাগবে, তা সম্পর্কে আপনার ধারণা ঠিক না। দ্বিতীয়ত, আপনি কোনো কারণে শুরু করতে ভয় পাচ্ছেন, তাই সুযোগ পেলেই পিছিয়ে দিচ্ছেন কাজটা। তৃতীয়ত, আপনি এখন যে কাজটা করছেন, সেটাকে আপনার যে কাজ করা দরকার ছিল, তার চেয়ে

বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। এবং চতুর্থত, যে কাজটা করা দরকার, তাতে আপনার আগ্রহ নাই এবং তাতে ভালো করার কোনো দরকার আছে বলেও মনে করেন না।

কারণ বুঝে নেওয়ার পরে আপনার কাজ হবে আস্তে আস্তে নিজেকে পাল্টানো, আলসেমির ভূতটাকে ঘাড় থেকে জোর করে নামানো। তা কিন্তু বেজায় কঠিন, মামদোভূতের মতোই গিরিঙ্গি টাইপের এই আলসেমির দানো।

তবে উপায় আছে বটে। একটু কষ্ট করতে হবে, হতে হবে কৌশলী।

মাপুন : কাজটা করতে কত সময় লাগতে পারে, তা ঠিকমতো আন্দাজ করে নিন। অন্যদের কতটা সময় লেগেছে অমুক চ্যাপ্টার পড়ে শেষ করতে কিংবা রিপোর্ট লিখতে, তা জেনে নিন। অথবা নিজেই যা করতে হবে, তা বা তার কাছাকাছি কাজ আগে করার অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করুন কতটা সময় লাগতে পারে। করেছেন? এবার এই সময়টাকে দুই দিয়ে গুণ করেন। বাস্তবে আপনার লাগবে এই আন্দাজের সময়ের দ্বিগুণ সময়ের মতো।

মনকে ঠকান : আমাদের মন যদি কুঁড়ের হদ্দ হয়, তাহলে তাকে ঘোল খাইয়ে কৌশলে পরিশ্রমী, অ-আলসে বানিয়ে নিন। আপনার ডেডলাইন যদি হয় জানুয়ারির ২০, তাহলে মনকে মিথ্যা মিথ্যা বোঝান, ডেডলাইন আসলে জানুয়ারির ১৫। এবার আপনি ওই জানুয়ারি ১৫ ডেডলাইন ভেবে আগের মতো আলসেমির চালে কাজ করুন। আপনার আলসেমির চুলকানিও মিটল, আবার এই নতুন ডেডলাইন আসল ডেডলাইনের কয়েক দিন আগে, কাজেই কাজটা ঠিকমতো করে করার জন্য সময় আসলেই পাবেন। আমি এক সময়, যখন হাতঘড়ি পরতাম, তখন হাতঘড়ির সময় ১০ মিনিট এগিয়ে রাখতাম। তার ফলে কখনো কোনো মিটিং বা ট্রেন মিস করতাম না। কারণ আমার ১০ মিনিট আগের সময়টাকেই আমি ডেডলাইন ধরে কাজ করতাম। মনকে ঠকানো হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু করেই দেখুন না, বাস্তবে কিন্তু এটা ভালোই কাজ করে।

মূলা পদ্ধতি : গাধার গল্প জানেন তো? তাকে দিয়ে গাড়ি টানাবার জন্য গাধার মালিক সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দেয়, গাধার ঠিক নাগালের

বাইরে। গাড়ি টানতে কষ্ট হলেও আলসে গাধা মুলার লোভে এগিয়ে যায়। আপনি গাধা নন, কিন্তু এই থিওরি আমরা মানুষরাও কাজে লাগাতে পারি। পুরস্কারের প্রতি মানুষের অবচেতনভাবেই মোহ আছে সব সময়ই। তাই নিজেকে কী পুরস্কার দেবেন, কাজটা শেষ করতে পারলে, সেটার সিস্টেম করেন। ডেডলাইনের আগে করলে বোনাস পুরস্কার রাখবেন। এভাবে করলে কিন্তু দেখবেন আপনার মন এই পুরস্কারের মুলার লোভেই দ্রুত কাজটা করছে, আলসেমিকে ঝেড়ে ফেলে।

আগের কাজ আগে : অগ্রাধিকার বের করেন আপনার কাজের। যে কাজটা করতে আলসেমি করছেন, সেটা কেন করা দরকার? হতে পারে, সেটা পরীক্ষা পাসের জন্য পড়া দরকার, না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর পাবেন। অথবা কাজটা জমা না দিলে ফেল করবেন। এভাবে সব কাজের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার (করলে কী হবে, না করলে কী পরিণাম হবে) এসব লিখে ফেলুন। এবার চিন্তা করে দেখুন, আলসেমি করে এখন যে কাজের জন্য অন্য কাজটা ফেলে রেখেছেন, তার চেয়ে আপনার বর্তমানের এই কাজ (যেমন— ঘুমানো, ফেসবুকিং, টিভি দেখা ইত্যাদি) অনেক বেশি দামি কি না। লাভ-ক্ষতির হিসাবটা একবার খাতা-কলমে লিখলেই দেখবেন অনেকটা প্রণোদনা পাচ্ছেন আপনার মনে, কাজটা দ্রুত সেরে ফেলার জন্য।

কাজটাকে ভাগ করে ফেলুন : একবারে বড় কাজটা করতে গিয়ে আলসেমি পেয়ে যদি বসে, তাহলে বরং এক কাজ করুন, কাজটাকে সম্ভব হলে ভাগ ভাগ করে ফেলুন। এক দিনে পুরোটা করতে যদি অনেক সময় লাগে, তাহলে বরং কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে কাজটা করুন ভাগে ভাগে। তাহলে হয়তো এতটা আলসেমি লাগবে না।

বন্ধুবান্ধবের চাপ : পিয়ার প্রেশার অনেক কার্যকর জিনিস। কাজটা একা একা করতে গেলে যদি আলসেমি পেয়ে বসে, বন্ধুদের সাথে কথা বলে করুন। দরকার হলে কে আগে করতে পারে, সেভাবে প্রতিযোগিতা করুন। আমরা মানুষেরা কিন্তু প্রতিযোগিতাকে খুব পছন্দ করি। প্রতিযোগিতা যদি থাকে তাহলে সেটার জন্য হলেও, অথবা মানসম্মান রক্ষার্থে কাজটা আপনি দ্রুতই করবেন, আলসেমিকে জানিয়ে বিদায়।

কার্যতালিকা বানান : আপনাকে কী কী কাজ করতে হবে, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অথবা কোনো কিছু পড়ে শেষ করার জন্য, অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো

আপনার সেই বিষয়ে পূর্ণ ধারণা নাই। তাই কাগজে-কলমে কার্যতালিকা বা টু-ডু লিস্ট বানান। কাজের তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন কাজটার ব্যাপকতা বা জটিলতা কতটুকু। সেই সাথে কোনো কাজ করতে গিয়ে অন্য কিছু ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও কমবে।

রুটিন বানান, মেনে চলুন : রুটিন করে কাজ করা খুব দরকার। মানুষ অভ্যাসের দাস। রুটিন করে প্রতিদিন কিছু না কিছু করার অভ্যাস থাকলে আলসেমির প্রকোপ কিছুটা হলেও কমবে।

আলসেমি থেকে মুক্তি পাওয়াটা অনেক কঠিন। ওপরের পরামর্শগুলো কাজে লাগান, আশা করি অল্প হলেও আলসেমি কাটবে।

হতাশা কাটানো বা আত্মবিশ্বাস বাড়ানো

পড়ালেখা করতে গিয়ে হতাশ হয়নি এমন কেউ মনে হয় নাই। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়া, পড়তে বসে কিছুই বুঝতে না পারা কিংবা সময়মতো দরকারি কাজ করতে না পারাটা দুনিয়ায় সব মানুষের জীবনেই ঘটেছে। এমনকি যেসব অদম্য ভালো ছাত্রছাত্রী জীবনে কোনোদিন দ্বিতীয় হয়নি, তাদের জীবনেও কিন্তু এরকম অব্যক্ত অধ্যায় আছে, যেখানে তাদের পছন্দের ফলাফল না পেয়ে তারা হয়েছে হতাশায় নিমজ্জিত।

হতাশা পড়ালেখার জন্য খুবই বাজে একটা জিনিস বেশ কয়েকটা কারণে— হতাশার বিস্তার পৌনঃপুনিক। একবার মাথায় ঢুকে গেলে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। মাথা থেকে তাকে দূর করা হয়ে পড়ে অসম্ভব। আর এই হতাশার চাপে পড়ে অন্য সব কাজের বারোটা বাজে। হতাশায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আগে যা পারতেন, তা-ও হয়তো আর পারবেন না।

তাই হতাশা কাটানোটা খুউব খুউব দরকার।

আপনি কি পরীক্ষায় কিচ্ছু পারেননি, ফলাফল করেছেন জঘন্য, সে জন্য বাসায়, বাইরে সবখানে তিরস্কার শুনতে হচ্ছে? তাহলে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুর গল্প করতে পারি। বুয়েটে কম্পিউটারকৌশলে একজন সহপাঠী আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে কম জিপিএ নিয়ে পাস করেছিল। নিয়মমাফিক হতাশ হতে গেলে তার কিন্তু জীবনটা কাটতে পারত এই অল্প জিপিএর হতাশায়। কিন্তু সেটা সে করেনি, বরং বিপুল উদ্যমে এগিয়ে গেছে, পেশাগত জীবনে খুব ভালো প্রকৌশলী হয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরে এখন সে নিজের মেধার জোরে বিশ্বের সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে সাফল্যের সাথে। কিংবা আরেকজন বন্ধু, ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠতে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল। শিক্ষক আর বাড়িতে অভিভাবক— কেউই মনে হয় তাকে তিরস্কার করতে পিছপা হননি সে সময়। অথচ সময়ের পরিক্রমায়

এই বন্ধুটি ব্যাংকিং জগতে নিজের মেধার পরিচয় দিয়েছে, প্রচণ্ড ভালো ফলাফলের পাশাপাশি এখন দেশের উদীয়মান ব্যাংকিং এক্সিকিউটিভদের একজন হিসেবে এক নামে সবাই তাকে চেনে। আইনস্টাইন আর টমাস আলভা এডিসনের গল্পটাও মনে করে দেখেন, এদের দুজনকেই অল্প বয়সে সবাই বোকাসোকা বলে রায় দিয়ে দিয়েছিল। তারা কিন্তু হতাশার অন্ধকারে জীবনটাকে কাটিয়ে দেননি। এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে, এই গানটার মতোই ওপরের এই কয়জন যাদের কথা বললাম, তারা সবাই এগিয়ে গেছেন, সাফল্যকে এনেছেন হাতের মুঠোয়।

আপনাকেও ঠিক সেটাই করতে হবে, পড়ালেখা নিয়ে হতাশা একবার এলেই ঝেঁটিয়ে তাকে করতে হবে বিদায়।

জিদ : হতাশা তাড়ানোর ভালো উপায় হলো হতাশাকে জিদ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। ব্যক্তিগত একটি উদাহরণ দিই যা অনেকের কাছে হাস্যকর ঠেকতে পারে, এসএসসি পরীক্ষার মেধাতালিকায় প্রথম হতে না পেরে আমার মনে কিছুটা হতাশা ছিল। কিন্তু সেটাকে মাথায় না রেখে দিয়ে জিদে পাল্টে ফেলি, যার ফলে এইচএসসিতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাই। আমার এক বন্ধু এসএসসিতে খুব ভালো ফল করার পর উচ্চ মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় স্থান পায়নি। তার মনে হতাশার বদলে এতটাই জিদ চাপল যে, মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় সে সারা দেশে প্রথম ১০ জনের মাঝে স্থান করে নিল। কাজেই হতাশাকে হটিয়ে দিন, জিদকে বসান সেখানে, ভালো ফল করার ভালো করে পড়ালেখা করার জিদ।

আত্মবিশ্বাস : আপনি একটি পরীক্ষায় খারাপ করলে কিংবা একটি বিষয় না বুঝতে পারলেই কিন্তু আপনি ফেলটু নন, গর্দভ নন। অধিকাংশ মানুষের মেধা, বুদ্ধিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। যে ভালো করেছে, সে বিদ্যাকৌশলের নানা দিক রপ্ত করে ফেলেছে আপনার চেয়ে ভালো করে, এই যা। এবং চেষ্টা করলে আপনিও সেটা অবশ্যই পারবেন। সে জন্য আত্মবিশ্বাসী হন, আপনার নিজের মাঝে শক্তি আছে, সম্ভাবনা আছে, এ ব্যাপারটা খুব ভালো করে বিশ্বাস করুন।

হতাশামূলক জিনিস অগ্রাহ্য করুন : পরশ্রীকাতরতার কথা আমরা ঘৃণার সাথে বললেও আসলে কিন্তু আমরা সবাই কমবেশি পরশ্রীকাতর। আপনি নিজে যে ফল পাননি, সেই ফল আরেকজনে পেয়ে বসেছে, সেটা দেখলে

মনের মধ্যে হিংসা হতাশা আসতে বাধ্য। স্বীকার করেন বা না-ই করেন। এটা হবেই। তা এড়ানোর জন্য যা করতে হবে তা হলো এ ধরনের বাজে অনুভূতি মনের মধ্যে আনে এমন যেকোনো কিছুকে অগ্রাহ্য করা। অমুকে তমুক জায়গায় চান্স পেয়েছে, তো আপনার কী? মন থেকে তথ্যটাই ডিলিট করে দিন।

সেকেন্ড চান্সে বিশ্বাসী হোন : মানুষের জীবন অনেক বিস্তৃত। একটা রাস্তা বন্ধ হলে তার মানে কিন্তু এই না যে আর রাস্তা নাই। একটি মাত্র পরীক্ষা বা একটি বিষয়ে পড়া/বোঝা মনমতো হয়নি বলে তার মানে এই না, অন্য সবকিছুও সেরকমই হবে। তাই সেকেন্ড চান্সে বিশ্বাসী হোন, মনে আনুন আশার আলো।

অন্যে কী করে, কী বলে, তাতে আপনার কী? : অমুকে তমুক জিনিস পারে, সমুকে অত পেয়েছে, এতে আপনার কী? নিজে কী পেলে সুখী হবেন, সেটা আগে বের করুন, কপিপেস্ট জীবনযাপন করে তো কোনো লাভ নাই, নিজের মতো করেই নিজের সামর্থ্য অনুসারে চলুন।

এবং যত গর্জে, তত বর্ষে না : অমুকে এই জিনিসটা খুব ভালো পারে, আপনি কিছুই বুঝছেন না। ক্লাসে আপনার বন্ধু ফটফট করে অনেক কিছু বলছে, সেটা আবার আপনি পারছেন না। এর মানে কি আপনি বোকা, আপনার বন্ধুটি মেধাবী? বিশ্বাস করুন, উল্টাটাও হতে পারে। খালি কলসি যেমন বেশি ঝনঝন করে বাজে, সেরকম অনেকেই এরকম কিছু না জেনে বা অনেক সীমিত জ্ঞানেই ভাব দেখায় তারা না জানি কত কিছু পারে। এসব অভিনয়ে বিভ্রান্ত বা হতাশ হওয়া বাদ দিন।

হতাশার আলোকে মন থেকে দিন সরিয়ে, আনন্দময় জীবনকে গড়ুন নিজের মতো করে।

পরীক্ষাভীতি বা নার্ভাসনেস কাটানো

পরীক্ষা দিতে গিয়ে নার্ভাস হয়নি এমন কেউ যদি থাকে, সে মহাপুরুষ বা মহামহিলা। অথবা রোবট। আপনি আমি এরকম আম-জনতারা কিন্তু পরীক্ষাকে অবশ্যই ভয় পাই, সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করি বা না করি।

পরীক্ষাভীতির ব্যাপারটা অনেকটা বড় প্রভাব ফেলে আপনার পরীক্ষার প্রস্তুতির ওপরে। এবং আসল পরীক্ষাতেও। কারও যায় ঘুম চলে, আবার কারও হাত কাঁপে, জানা জিনিস মাথা থেকে হয়ে যায় গায়েব, খাওয়াদাওয়া-নাওয়া সবই মাথায় উঠে।

অন্যদের কথা বলার আগে আমার নিজের গল্পই করি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম আজ থেকে ২০ বছর আগে। সেই সময়ে হঠাৎ বিশাল এক পরীক্ষাভীতি পেয়ে বসল এবং তার ফলাফল হিসেবে রাতের ঘুম গায়েব হয়ে গেল। কিছুতেই আর ঘুম আসে না, অথচ সারারাত না ঘুমালে পরীক্ষায় বড় রকমের গণ্ডগোল করার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কেন, এমন তো না যে আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না, বরং খুব ভালো করেই প্রস্তুত ছিলাম। প্রতিবেশী একজন মনোচিকিৎসক (এখন উনি খুবই বিখ্যাত, এক নামে চেনে সবাই তাকে) ব্যাখ্যা দিলেন, আসলে আমি ঘুমাতে না পারার ভয়েই ঘুমাতে পারছি না। খেয়াল করে দেখলাম, আসলেই কিন্তু ঘটনা তাই। এক রাত না ঘুমালে কিচ্ছু হবে না, এ ব্যাপারটা নিজেকে বোঝানোর পরেই সমস্যা মিটে গেল, ঘুমের ওষুধ ছাড়াই দিব্যি ঘুমাতে পারলাম পরীক্ষার আগে।

এখন প্রশ্ন হলো, আপনার কী করার আছে?

রিলাক্স করতে শিখুন : পরীক্ষাকে ভয় পায় না এমন কেউ কিন্তু নাই। আমার নিজের উদাহরণই দিয়েছি। কলেজ ছাড়ার বহু বছর পরে এখনো অনেক সময়ে নানা পরীক্ষা দেওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখি। এ জন্য প্রথম কাজ হলো রিলাক্স করা— বুক ভরে শ্বাস নিন। মনে মনে বলুন, 'আমি পারব, অবশ্যই পারব।' আর পরীক্ষার হলে যদি কোনো কিছু নাই পারেন, তাহলে ভাবুন,

'ব্যাপার না'। কী হবে? বড়জোর একটা পরীক্ষা খারাপ হবে। আপনি কি মারা পড়বেন? মোটেও না। আর একটা পরীক্ষা দিয়ে জীবন বদলে যায় না, বরং নানা রকমের অনেক সুযোগ তো আছেই।

বিরতি নিন : পরীক্ষার হলে বসে কিছু পারেন না বলে যদি মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে। তাই এমন ভয় আসা মাত্র একটু মিনিট খানেকের বিরতি নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা-দুশ্চিন্তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিন। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শরীরের মাংসপেশিগুলোকে রিলাক্স করুন। হাত-পা নাড়াচাড়া করে নিন। দরকার হলে বাথরুম ব্রেক নিন। মোট কথা মাথাটাকে রিফ্রেশ করে ফেলুন এই বিরতি নিয়ে। তার পর ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, যা বাজে প্রশ্ন এসেছে তা তো কিছু করার নাই, এর মধ্যে কী কী পারবেন এবং যা পারবেন তা-ই জবাব দিন। ফলাফল কী হবে, সেই চিন্তা না হয় পরেই করবেন।

পরীক্ষাভীতির কারণ দূর করুন : পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো হয়নি বলেই তো ভীতি, তাই না? সে জন্য ভালো করে এবং সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিন। যাতে করে শেষ সময়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে পরীক্ষাভীতি পেয়ে না বসে।

চেকলিস্ট করে রাখুন : পরীক্ষার হলে সবকিছু নিচ্ছেন কি না, পরীক্ষার তারিখ-সময় এসব ঠিক মনে আছে কি না অথবা সিলেবাসে কিছু বাদ পড়ে গেছে কি না, এ নিয়ে ভয় পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বরং আগে থেকে চেকলিস্ট করে রাখুন, দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দেওয়া মাত্র তালিকা বের করে যাচাই করে নেবেন।

পড়াশোনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্যপ্রযুক্তি এই দুনিয়াকে চিরতরে পাল্টে দিয়েছে। পড়াশোনার জগৎও তার ব্যতিক্রম নয়। ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধা এনে দেয়।

আসুন, দেখা যাক, পড়ালেখায় কীভাবে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগাবেন।

শুরুতেই ধরে নিই, আপনার কাছে একটি কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন আছে।

নোট করা : খাতায় লিখে নোট করার বিকল্প নাই। কিন্তু কোনো বিষয়ে রিসার্চ করতে গেলে ইন্টারনেটে সার্চ করার দরকার পড়ে। সার্চ করে বের করা তথ্য টুকে রাখার জন্য ইলেকট্রনিক নোটবুক ব্যবহার করেন। নানা কোম্পানি এরকম নোটবুক সফটওয়্যার বের করেছে ডেস্কটপ কিংবা মোবাইল ফোন সব প্ল্যাটফর্মের জন্যই। আমি এ বইটি লেখার সময় ব্যবহার করেছি মাইক্রোসফটের ওয়াননোট।

রেফারেন্স জোগাড় : ইন্টারনেটে আজকাল যেকোনো বিষয়ে অঢেল তথ্য পাওয়া যায়। পাঠ্যবইয়ের ওপরে নির্ভর না করে কনসেপ্ট পরিষ্কার করার জন্য ইন্টারনেটে এ বিষয়ের টিউটোরিয়াল খুঁজে নিন।

অনলাইন কোর্স : বর্তমানে পৃথিবীর নানা ভাষাতেই ফ্রি অনলাইন কোর্স পাওয়া যায়। এমন কিছু সাইট হলো Coursera, Udacity, edX, Khan Academy, Shikkhok ইত্যাদি। আপনার যে বিষয়ে পড়ারই দরকার হোক না কেন, সেই বিষয়ে পূর্ণ কোর্স, লেকচার নোট এবং ভিডিও অনলাইনে পাবেন। সেগুলো ডাউনলোড করে নিন এবং ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি সেটা দেখে পড়া ও জানাটা পোক্ত করে নিন।

পোমোডরো টেকনিক : সময় ব্যবস্থাপনার পোমোডরো টেকনিকের কথা আগেই আরেকটি অধ্যায়ে বলেছি, যাতে মনোযোগ বাড়ানো এবং কাজ করার দক্ষতা বাড়ানো যায়। আপনার স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের জন্য পোমোডরো টেকনিকের টাইমার অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিন। ইন্টারনেটে Pomodoro timer দিয়ে সার্চ করলেই এটা খুঁজে পাবেন।

ড্রপবক্স বা এরকম ব্যাকআপ টুল : অনেক কষ্ট করে এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়াল জোগাড় করেছেন, এখন যদি কম্পিউটার ক্রাশ করে সেটা গায়েব হয়ে যায়, তাহলে তো সমস্যা, তাই না? সে জন্য ড্রপবক্স বা এরকম ব্যাকআপ টুল ব্যবহার করুন।

স্মার্টফোনের আরও ব্যবহার : এক সময়ে নোট বা এরকম কিছু কপি করার জন্য ফটোকপির দোকানে দৌড়াতে হতো। এখনো কি আপনি সেই যুগে পড়ে আছেন? আপনার ফোনটা দিয়ে নোটের পাতার ছবি তুলে নিন। এখনকার ফোনের ক্যামেরা অনেক বেশি রেজুলিউশনের, মাঝারি আলোতেও ভালো ছবি তুলতে পারে। কাজেই ক্লাসনোট বা বই এসবের ফটোকপি করার বদলে দ্রুত ছবি তুলে নিজের কাছে রাখুন বা নিজেকেই নিজে ইমেইল করে দিন।

স্প্রেডশিটের ব্যবহার : পড়াশোনার নানা বিষয়ের তালিকা, নিজের অগ্রগতি, এসবের হিসেবে রাখার জন্য স্প্রেডশিট ব্যবহার করুন। এক্সেল কিংবা গুগল শিটের ব্যবহার করুন।

গুগল ডক : কয়েকজনে মিলে একসাথে প্রজেক্ট রিপোর্ট লেখার জন্য গুগল ডক বা এরকম অনলাইন ডকুমেন্ট শেয়ারিং টুল ব্যবহার করুন। এতে করে একসাথে মিলেই সবাই রিপোর্টের নানা অংশের ওপরে কাজ করতে পারবেন।

ক্যালেন্ডার : টু ডু লিস্ট এবং ক্যালেন্ডার অ্যাপ্লিকেশনের যথাযথ ব্যবহার করুন। পরিকল্পনা করার জন্য এসবের বিকল্প নাই। খাতা-কলম তো ভালো বটে, কিন্তু স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধা হলো সময়মতো নোটিফিকেশন পাঠানোর ব্যবস্থা থাকে, ফলে আপনি কাজটা ভুলে গেলেও ফোনই খেয়াল করিয়ে দেবে। আপনার আগামী মাস খানেকের পরিকল্পনা কাগজে-কলমে করার পাশাপাশি স্মার্টফোনের বা ওয়েব ক্যালেন্ডারে (যেমন— গুগল ক্যালেন্ডার) লিখে রাখুন।

ওয়েবসাইট/ সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্লকার : অনলাইনে নানা সাইটে সময় নষ্ট করার প্রবণতা প্রায় সবারই আছে। অল্প একটু সময় ফেসবুকে দেবেন ভেবে ঢুকলেন, চোখের নিমেষেই হয়তো কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা সবার অ্যালবাম আর পোস্ট দেখে দেখে। তো, কীভাবে ফেসবুকের নেশা থেকে বাঁচবেন? এ জন্য সহজ সমাধান হলো অ্যাকাউন্ট ডিএকটিভেট করে দেওয়া। কিন্তু তার পরও মনে হয় না খুব বেশি সময় এড়াতে পারবেন, একটিভেট করে নেওয়া তো খুব সহজ তাই না? আর কেবল কি ফেসবুক—আরও কত এরকম সাইট আছে, যেখানে অনেক সময় হয়তো দিচ্ছেন। আপনি হয়তো জানেনেই না যে অনলাইনে কতটা সময় আপনি কাটান নানা সাইটে।

সে জন্য হিসাব করুন প্রথমে, কোন সাইটে কতটা সময় কাটাচ্ছেন। আর দরকার হলে কোটা বরাদ্দ করুন, যেমন ফেসবুকে দিনে আধা বা এক ঘণ্টার বেশি থাকবেন না। নানা ব্রাউজার প্লাগিন দিয়ে এই কাজটা করা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করি StayFocused নামের একটি প্লাগিন। এটা আপনাকে দেখাবে কোন সাইটে কতটা সময় দিয়েছেন, আর আপনি নিজেই নির্ধারণ করে দিতে পারবেন কোটা। ফলে সেই সময়, যেমন আধা ঘণ্টা ফেসবুকে কাটানোর পরে এই সফটওয়্যারটি নিজে থেকেই ফেসবুকের পেজে আর ঢুকতে দেবে না সে দিনের জন্য।

অভিভাবকদের জন্য

আপনার সন্তানকে কীভাবে পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন

এই অধ্যায়টা আসলে শিক্ষার্থীদের জন্য না; বরং তাদের অভিভাবকদের জন্য। তাই এক কাজ করুন, এ লেখাটা নিয়ে আপনার অভিভাবককে দেখান, পড়ান।

অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকটা বটগাছের মতো। ছায়া দিয়ে, পড়ার জন্য দরকার সবকিছু দিয়েই বাবা-মায়েরা সন্তানদের পড়ালেখায় ভালো করার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তারা কী কী কাজ করতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদের কাজে আসবে? আর কী কী কাজ করলে সেটা ভালোর বদলে সমস্যার সৃষ্টি করবে? আসুন, দেখা যাক।

পড়ায় উৎসাহ দেওয়া

বাবা-মায়েরা সবচেয়ে বড় যে কাজটা করতে পারেন, তা হলো পড়ায় উৎসাহ দেওয়া। ছোট ছোট কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশংসা করুন। আবার বেশি প্রশংসাও করবেন না। মাত্রা রেখে প্রশংসা করুন, তাতে করে আপনার সন্তানটি উৎসাহ পাবে।

পড়ার পরিবেশ করে দেওয়া

পড়ার জন্য যে পরিবেশ লাগে, সেটা করে দিন। বাসার মধ্যে সারাক্ষণ অতিথি কিংবা হইচই, আড্ডা চললে সেটা আপনার সন্তানের পড়ায় অনেক ঝামেলা করবে। তাই খেয়াল রাখুন। পড়ার জন্য আলাদা চুপচাপ একটা জায়গা করে দিন।

অনুপ্রেরণা দিন

অনুপ্রেরণার মতো বড় জিনিস আর হয় না। সন্তানদের পড়ায় উৎসাহিত

করতে বকা কিংবা পুরস্কারের চেয়ে বেশি কার্যকর হলো তাদের অনুপ্রাণিত করা। স্বপ্ন দেখান, স্বপ্ন দেখতে শেখান। সেই স্বপ্নের জন্যই আপনার সন্তান পড়াশোনা করবে, ভালো করে নিজের স্বপ্নকে গড়ে নেবে।

নিজে উদাহরণ হোন

আপনি নিজে আপনার সন্তানের কাছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারেন। বাসায় কি আপনি সারাক্ষণ টিভিতে সিরিয়াল দেখায় ব্যস্ত থাকেন? তা না করে আপনার সন্তানের পড়ালেখার খবর রাখুন। বাসায় টিউটর বা গৃহশিক্ষক রেখে দিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করে নিজে আড্ডাবাজি বা সিরিয়ালবাজিতে নেমে পড়বেন না; বরং নিজেই খেয়াল করুন। সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের হই-হুল্লোড়ে যেন সন্তানের পরীক্ষা বা দরকারি পড়ার সময়টা নষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

যা করবেন না

অন্যের সাথে তুলনা করবেন না : অমুকের ছেলে ফার্স্ট হয়েছে, আপনার ছেলে হয়নি, এ কারণে বকাঝকা করার মতো নেগেটিভ কাজ আর হয় না, আপনার এই তুলনাবাজি কিন্তু ভালোর বদলে আপনার সন্তানের মনে এটা আরও খারাপ প্রভাব ফেলবে। হীনম্মন্যতা খুব খারাপ জিনিস, আর বাবা-মায়ের মতো কাছের মানুষের কাছ থেকে মন ছোট করে দেওয়ার মতো কথা শুনলে তা যে কারও মন ভেঙে দিতে বাধ্য। তাই অন্যের সাথে তুলনা করা, গাধা বলা, এসব বাদ দিন।

ভালো ফলাফলের ওপরে অতিরিক্ত জোরাজুরি করা : পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে বড় ব্যাপার হলো আপনার সন্তানটি কতটুকু শিখছে, কতটুকু জানছে। আর বিশেষ করে স্কুল-কলেজে কোনো পরীক্ষায় কেউ একটু খারাপ করলে সেটা আদৌ ভবিষ্যৎ জীবনের ওপরে খুব বড় প্রভাব ফেলে না। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে বকাবকি করে পড়াটাকে আতঙ্ক বানিয়ে ফেলবেন না। আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারতাম, কিন্তু একটাই দিই, আমার সেই স্কুলের বন্ধুর কথা বলে, যে ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠতে গিয়ে প্রায় আটকে গিয়েছিল খারাপ ফল করে। আজ ২২ বছর পরে সে হয়েছে দেশের ব্যাংকিং জগতের এক বড় তারকা, স্নাতক পর্যায়েও তার বিষয়ে সে অনেক ভালো ফল করেছিল। তাই স্কুল-কলেজের বাচ্চাদের

পড়ায় অমুক করতে হবে, তমুক পেতেই হবে এবং তা না পেলে বকাবকি বা মারধর করা, এসব একেবারেই বাদ দিন। জীবন একটাই, সেই জীবনের শৈশবের মধুর সময়টা তাদের উপভোগ করে বেড়ে উঠতে দিন, ভালো ফল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন বটে, কিন্তু আপনার নিজের মনমতো ফলাফল তারা করতে না পারলে তাদের পেছনে লাগবেন না।

শেষ কথা

পড়াশোনায় ভালো করার জন্য বিদ্যাকৌশলের নানা কায়দা আপনাকে প্রস্তুত করে দেবে সঠিক নিয়মে, গুছিয়ে শেখার জন্য, আর সেই জ্ঞানকে যথাযথভাবে পরীক্ষায় উপস্থাপন করার জন্য।

কিন্তু এ বইটি আলাদিনের জাদুর চেরাগ নয়।

এটাকে কাজে লাগাতে হলে একজনের সাহায্য ও প্রচেষ্টা লাগবে সবার আগে।

সেটা আপনি নিজেই।

আপনাকে প্রথমেই নিজের ওপরে বিশ্বাস আনতে হবে। জন্মগত মেধা একেক জনের একেক রকম, তার ওপরে আপনার-আমার হাত নাই, কিন্তু যে যা মেধা পেয়েছি, সেটাকে গুছিয়ে কাজে লাগালে আমরা প্রত্যেকেই অনেকদূর যেতে পারি। আপনিও পারবেন।

তাই সবার আগে নিজের ওপরে আস্থা আনুন। আপনি নিজে উদ্যমী হয়ে গুছিয়ে পড়াশোনা ও শেখার কাজটা করলে অবশ্যই সফল হবেন। যে যা-ই বলুক না কেন, সেই ক্ষমতা, সেই দক্ষতা আপনার আলবৎ আছে।

তাই বিদ্যাকৌশলী হোন, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে এগিয়ে যাওয়ার কাজটা শুরু করে দিন।

আজকেই। এখনই। এই মুহূর্তেই।

শুভ হোক আপনার এই অভিযাত্রা।